

# আন্দালুস হারানোর ৫২৭ বছর

#আন্দালুস\_সপ্তাহ, ২০১৯



মুহতারাম আতিক উল্লাহ সাহেবের “খিলাফাহ রাশিদাহ” গ্রুপ থেকে ২রা জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে আন্দালুস হারানোর ৫২৭ বছর উপলক্ষে আন্দালুসের স্মৃতি চারণ, আন্দালুসের স্মরণ, আর আন্দালুস নিয়ে ক্রন্দনের নিমিত্তে পালিত হয় ‘আন্দালুস সপ্তাহ’। এক সপ্তাহ যাবত এ গ্রুপের মেম্বারগণ আন্দালুস সম্পর্কে জেনেছে, জানিয়েছে, ভেবেছে, ভাবিয়েছে, কেঁদেছে এবং কাঁদিয়েছে। সেই ভাবনা, সেই কান্না, সেই স্মৃতিচারণ এবং সেই জানা-অজানা ইতিহাসের নানা গলি ঘুপজি ভ্রমণকে তুলে এনেছি উক্ত সংকলনে। সকলকে আল্লাহ্ জাযায়ে খায়ের দান করুন।

# আল-আন্দালুস: আমাদের হারানো ফিরাদওস!

আতিক উল্লাহ

## প্রথম পর্ব

দিনলিপি-১৭৯

(০২-০৫-২০১৫)

\*\*\* আন্দালুস। নামটার মধ্যেই কেমন যেন আপন আপন ভাব আছে। সাথে সাথে কেমন যেন বিরহ বিরহ ভাবও আছে। সবই হয়তো মনের কল্পনা। তবুও মনের কল্পনা তো ভালোবাসা থেকেই তৈরী হয়।

মূল পর্বে যাওয়ার আগে, সামান্য একটু ভূমিকা:

= আল্লাহ তা'আলার রীতিনীতিতে কোনও পরিবর্তন নেই। আমাদের প্রয়োজনেই, এই রীতিনীতিগুলো জানা জরুরী। তাহলে জীবনটা সহজ হয়ে যায়, সুন্দর হয়ে ওঠে।

আল্লাহ তা'আলার স্বীকৃত নীতি হলো, একশ ডিগ্রী গরম হলে পানি টপবগ করে ফুটতে থাকবে। এই নীতি কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এর কমবেশ হবে না। যদি এমন হতো, আজ ত্রিশ ডিগ্রীতে পানি ফুটতে শুরু করেছে। কাল চল্লিশ ডিগ্রী। পরশু পঞ্চাশ ডিগ্রী তাহলে জীবনটা কেমন হতো? টিকে থাকাই দায় হয়ে যেতো।

আগুনের ধর্ম হলো পোড়ানো। কেয়ামত পর্যন্ত আগুন এই ধর্মের ওপরই বহাল থাকবে। এর ব্যত্যয় ঘটবে না। ব্যতিক্রম হবে না। এটাই চিরাচরিত বিধান। ইব্রাহীম (আ.) আগুনে পোড়েন নি, সেটা মু'জিয়া। একজন মুমিন মু'জিয়ার তালাশে থাকবে না, বস্তুর স্বাভাবিক যা ধর্ম সেটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে।

খাবার ছাড়া কোনও প্রাণী বাঁচতে পারে না। কোনও মানুষ যদি খাবার ছাড়া কয়েক দিন থাকে, সে মারা যাবে এটাই আল্লাহর বিধান।

বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও আল্লাহর বিধান হলো, একটি জাতি একসময় সবল থাকবে, তারপর আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকবে। আবার দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে সবলতার দিকে যাবে। এটা মুসলিম-অমুসলিম সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।



ইতিহাসের আশ্চর্যজনক একটা বিষয় হলো, অদ্ভুতভাবেই সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সে হিসেবে বলা যায়, আমরা যখন অতীতের কোনও ইতিহাস পড়ি, প্রকৃতপক্ষে সেটা শুধু অতীত নয়, ভবিষ্যতেরও ইতিহাস। কারণ অতীতে যা ঘটেছে, মোটা দাগে সেটা ভবিষ্যতেও ঘটবে।

একজন মুমিন কিভাবে ইতিহাস পাঠ করবে?

= তার ইতিহাস পাঠের ধরন হবে, অতীতের ভাল মানুষেরা কিভাবে কাজ করেছেন, কোন পথে হেঁটেছেন, সেটা যাচাই করা। সে অনুযায়ী নিজে চলার পাথেয় সংগ্রহ করা।

আন্দালুসের ইতিহাসটাও আমাদের জন্যে এক জীবন্ত শিক্ষা। এর ইতিহাসে আল্লাহর বিধান এতটা স্পষ্ট হয়ে আছে, অন্য কোনও ইতিহাসে এতটা নেই। উত্থান-শিখর আরোহণ-পতন।

= তবে আমি শেষ পর্যায়কে পতন বলতে চাই না। বলতে চাই পুনরুত্থানের প্রস্তুতি ও প্রেরণা ও শিক্ষাগ্রহণ পর্ব।

আন্দালুসের ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় আছে। অন্য জাতিগুলোর ইতিহাসে উত্থান-শিখরছোঁয়া-পতনপর্বটা একবারই ঘটে। কিন্তু আন্দালুসে এই পর্বটা বেশ কয়েক বার ঘটেছে। এই বিষয়টা নিয়ে আমি প্রায়ই ভাবি, আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে বেশ কয়েক বার সতর্ক করেছেন। সহজে তিনি আমাদের থেকে এই ‘আলফিরদাওসুল মাফকুদ’ (হারানো স্বর্গ) ছিনিয়ে নিতে চান নি। তিনি হয়তো চেয়েছিলেন, এই স্বর্গ আমাদের হাতেই থেকে যাক, কিন্তু আমরা তার এই নেয়ামতের কদর করতে পারিনি।

আমরা কেন আন্দালুসকে পড়বো?

আন্দালুসের ইতিহাস আটশ বছরের। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, হিজরী সন হিসেবে আটশত পাঁচ বছরের। ৯২-৮৯৭ হিজরী। আর ঈসায়ী সন হিসাবে ৭৮১ বছর হয়। ৭১১-১৪৯২। এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে কিছু অংশ আছে, অনালোচিত, কিছু অংশ আছে বহুল আলোচিত। কিছু অংশের ওপর ধুলোর আস্তর জমেছে। কিছু অংশকে কুচক্রীরা বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে। তারা কিছু সত্যকে মিথ্যার মতো করে পরিবেশন করেছে আর কিছু মিথ্যা কে সত্যের প্রলেপ দিয়ে আমাদেরকে গিলিয়েছে। এটা অত্যন্ত ভয়ংকর একটা কাজ। আমাদের উচিত এর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়া। ধুলো-ময়লা সরিয়ে আসল সত্যকে বের করে আনা।

আন্দালুসের দীর্ঘ ইতিহাস পরিক্রমায়, অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। অফুরন্ত গল্প তৈরী হয়েছে। অগুনতি বাঁক সৃষ্টি হয়েছে। বেশুমার গাঁথার জন্ম হয়েছে। অনেক মুজাহিদের জন্ম হয়েছে। অনেক ভীক-কাপুরষও আত্মপ্রকাশ করেছে। অনেক মুতাকী-পরহেযগারের উন্মেষ ঘটেছে। অনেক শরীয়তবিরোধী নাস্তিক ব্যঙের ছাতার মতো গজিয়েছে। অনেক দ্বীনের রক্ষক মাথা উঁচু করে

দাঁড়িয়েছে। অসংখ্য বিশ্বাসঘাতক ফনা তুলেছে। এজন্য আমাদেরকে আন্দালুস জানা দরকার।

.

.

আন্দালুসের যা না জানলেই নয়

-----

আমাদের জানা দরকার ‘বারবাত প্রান্তরের’ ঘটনা। এটা এমন ঘটনা, গুরুত্বের দিক থেকে ইসলামের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত যুদ্ধগুলোর একটি হওয়ার মর্যাদা রাখে। এই বারবাত কোনও অংশে ইয়ারমুক-কাদেসিয়া থেকে কম নয়। এই বারবাতের মাধ্যমে শুধু আন্দালুস নয়, বিশ্ব ইতিহাসের বিরাট একটা অর্জনকে মুসলমানরা জয় করেছে।

= কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে এই বারবাত উপত্যকা বিস্মৃত। বিলুপ্ত। বিযুক্ত।

.

আমাদের জানা দরকার ‘জাহাজ পোড়ানো’র ঘটনা। তারিক বিন যিয়াদ (রহ.) আসলেই কি জাহাজ পুড়িয়েছিলেন? পোড়ালে কেন পুড়িয়েছিলেন? পাশ্চাত্যের সমালোচকদের কাছে এই ঘটনা এত প্রিয় কেন?

.

আমাদের জানা দরকার আবদুর রহমান দাখিল (রহ.) কে ছিলেন? ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন, আবদুর রহমান দাখিল না হলে, আন্দালুসে ইসলাম অনেক আগেই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতো।

.

আমাদের জানা দরকার আবদুর রহমান নাসের কে ছিলেন? তিনি তো ছিলেন মধ্যযুগে ইউরোপের সবচেয়ে বড় বাদশাহ। আমাদের জানা আবশ্যিক, তিনি কিভাবে এত উঁচু স্তরে আরোহণ করতে পারলেন। কিভাবে তিনি তার যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

.

আমাদের জানা দরকার, ইউসুফ বিন তাশাফীন কে ছিলেন? তিনি কেমন সেনাপতি ছিলেন, কেমন খোদাভীরু ছিলেন। কতটা শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন। তিনি সুদূর আফ্রিকার গহীনতম কোণে থেকেও, এমন অসাধারণভাবে বেড়ে উঠেছিলেন? এই কালো মানিকের মনে জিহাদের প্রতি এমন প্রবল ভালোবাসা-ই-বা কিভাবে তৈরী হলো?

.

আমাদের জানা দরকার অবিস্মরণীয় ‘যাল্লাকাহ’ প্রান্তরের লড়াইয়ের কথা। এই লড়াইয়ে হেরে গেলে মুসলমানদেরকে আরও কয়েক শত বছর আগেই আন্দালুস থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হতো।

.

আমাদের জানা দরকার আবু বকর উমার লামতুনীর কথা। এই মহান মুজাহিদের হাত ধরে আফ্রিকার পনেরটারও বেশি দেশ ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল।

.

আমাদের জানা দরকার আবু ইউসুফ ইয়াকুব মানসুরকে। যিনি চির অম্লান ‘আরাক’ যুদ্ধের মূল নায়ক। মুসলমানদেরকে অতুলনীয় বিজয় এনে দেয়া বীর। খ্রিস্টানদের বিষদাঁত ভেঙে দেয়া

সিপাহসালার।

আমাদের জানা আবশ্যিক মুরাবিতীনদের কথা। তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের কথা। কিভাবে সেটা শূন্য থেকে পুণ্যতে পৌঁছল?

আমাদের জানা আবশ্যিক মুয়াহহিদ্দীনদের কথা। তাদের প্রতিষ্ঠিত ‘দাওলাহ’র কথা।

আমাদের জানা দরকার মসজিদে কুরতুবার কথা। যেটাকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মসজিদ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিভাবে মুসলমানদের এই মহান নিদর্শনকে গীর্জায় রূপান্তরিত করা হলো?

আমাদের জানা দরকার ইসাবেলিয়ার অনুপম মসজিদটির কথা।

আমাদের জানা থাকা দরকার কুরতুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। পুরো বিশ্ব থেকে ভেঙে পড়া জ্ঞানার্থীদের কথা।

আমাদের জানা দরকার উমাইয়া পাঠাগারের কথা। এতবড় পাঠাগার কিভাবে গড়ে উঠলো?

আমাদের জানা দরকার যাহরা প্রাসাদের কথা। জানা দরকার যাহরা শহরের কথা।

আমাদের জানা দরকার হামরা প্রাসাদের কথা। তার অনিন্দ্য সৌন্দর্যের কথা।

পাশাপাশি জানা দরকার ‘ইকাব’ যুদ্ধের কথা। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা-শক্তি বেশি থাকা সত্ত্বেও পরাজিত হয়েছিল। যেন হুর্নাইনের খন্ডচিত্র ক্ষণিকের জন্যে ফিরে এসেছিল। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন:

-ইকাব যুদ্ধের পর আন্দালুসে যুদ্ধ করতে সক্ষম কোনও যুবকের দেখা মিলত না। এতটা বিপর্যয় ঘটেছিল।

আমাদের জানা আবশ্যিক কিভাবে আন্দালুসের পতন হয়েছিল। পতনের কারণগুলো কী কী ?

এটাও জানা দরকার, আন্দালুসে ইসলামের সূর্য ডোবার পর কোথায় উদিত হয়েছিল ? জানা দরকার আন্দালুসে সেই অপসৃত সূর্য একই সময়ে কিভাবে ‘কনস্টান্টিনোপল’ বিজয়ের মধ্য দিয়ে উসমানি খিলাফতে উদিত হয়েছিল?

আমাদের জানা দরকার ‘ভ্যালেনসিয়া’ শহরের সেই রোমহর্ষক গণহত্যার কথা। যেখানে এক দিনেই ষাট হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল।

আমাদের জানা দরকার ‘উক্বাযাহ’ হত্যাকাণ্ডের কথা। যেখানে ভ্যালেনসিয়ার মতো মর্মান্তিক

ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। একদিনেই ষাট হাজার নিরীহ মুসলমানকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল।

আমাদের জানা দরকার ‘বারবুশতার’ গণহত্যার কথা। যেখানে এক দিনেই চল্লিশ হাজার বনী আদমকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। কিভাবে সাত হাজার মুসলিম কুমারীকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

= ইতিহাস একই ভাবে আবার ফিরে আসে। আমাদের জানা দরকার কিভাবে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো ?

আমরা যদি এসব ইতিহাস জানি, মুসলমানদের কোমরভাঙ্গা অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর কথাও জানি, তাহলে আজ, বর্তমানেও কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, সেটা জেনে যাব।

আমরা চেষ্টা করবো, প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে দেখতে। রাব্বের কারীম আমাদেরকে তাওফীক দান করলে কিছুই অসম্ভব নয়। ইনশাআল্লাহ।

## দ্বিতীয় পর্ব

দিনলিপি-১৮৬

(১০-০৫-২০১৫)

### স্পেনের ইলুদি

স্পেন সম্পর্কে ছয়টা কথা:

এক: বর্তমান স্পেন রাষ্ট্রটির ভিত দাঁড়িয়ে আছে একটি ‘শহীদ’ মুসলিম খিলাফাহর ওপর। একটি জান্নাতের ওপর। একটি হারানো স্বর্গের ওপর। সেই বাগানটির নাম ছিল আন্দালুস।

দুই: স্পেন আমাদের শহীদ সালতানাত দখল করে আছে। কিন্তু আরেকটি মুসলিম দেশও দখল করে আছে, যা আমাদের অজানা। দেশটির নাম মরক্কো। মরক্কোর বড় বড় তিনটা দ্বীপ তারা দখল করে রেখেছে। সাবতা, মালীলিয়াহ আর জাফরীয়াহ।

তিন: স্পেনেই সবার আগে ক্রুশেডের আগুন জ্বলে উঠেছে। ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে তারাই প্রথম খ্রিস্টবাদের ধ্বজা তুলে ধরে।

চার: স্পেন এমন একটা দেশ, যার প্রায় প্রতিটি গীর্জাই কোনও কোনও মসজিদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অসংখ্য শহীদ মসজিদের ওপর বাজে আজ চার্চের ঘণ্টা।



পাঁচ: স্পেনই বিশ্বে প্রথম ‘এথনিক ক্লিনজিং’ (জাতিশুদ্ধি) আবিষ্কার করে। পুরো মুসলিম উম্মাহকে তারা নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালায়। প্রায় দুই শতক ধরে। ধারাবাহিক ভাবে।

ছয়: স্পেনের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল ‘আইবেরীয় জাতি’র অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম স্পেনে আসার পর, আইবেরীয়রা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে স্পেনে কোনও স্থানীয় অধিবাসী নেই। এখানকার অধিবাসীদেরকে নিমূল করে দেয়া হয়েছে। মুসলিম হওয়ার অপরাধে। যারা এখন স্পেনে আছে, তারা ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা সংকর একটা জাতি।  
= আইনত এদের স্পেনে থাকার কোনও অধিকার নেই। এরা বহিরাগত।

ড. খালিদ ইউনুস। তিনি একজন বিশিষ্ট গবেষক। তার একটা কিতাব আছে। স্পেনে মুসলিম শাসনাধীনে ইহুদি।

ড. খালিদ চমৎকার লিখেছেন। তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, ইহুদীরা কত আরামে, কত আয়েশে আন্দালুসে থাকতো। সামান্য কয়েকটা দিক তুলে ধরা যাক :

এক: স্পেনে বসবাস কালে ইহুদিরা তাদের স্বকীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ করার সুযোগ লাভ করেছিল। স্বাধীনভাবে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ পেয়েছিল। পরম নিশ্চিন্তে বসবার করার যাবতীয় উপায়-উপকরণ হাতের নাগালেই ছিল। ইহুদীদের জ্ঞানচর্চা বিশেষ করে দর্শন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তারা অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেছিল।

ইহুদীরা শুধু যে তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই দর্শনচর্চা করতো তা নয়, তারা মুসলিম দর্শন দ্বারাও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। ইয়াহুদা হালিফী ছিলেন এমন একজন দার্শনিক। তিনি তার বিখ্যাত রচনা কিতাবুল হুজ্জাহ-তে ইমাম গাজ্জালীর রীতি অনুসরণ করেই দার্শনিকদের অনেক ভুলত্রুটির সমালোচনা করেছিলেন।

আন্দালুসে প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক হতো। সে বিতর্কে সব ধর্মের পণ্ডিতগনই অংশগ্রহণ করতেন। স্বাধীনভাবে যে যার ধর্মের স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরতেন। এসব বিতর্ক আরবী ভাষাতেই হতো। সব ধর্মাবলম্বীরাই আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতেন।

মুসলমানদের সাথে ইহুদিদের এই উন্মুক্ত বাহাস করা থেকেই প্রমাণ হয়, তারা কতোটা চিন্তার স্বাধীনতা ভোগ করতো।

এমনি এক বিখ্যাত মুনাযারা হয়েছিল ইবনে হাযম (৯৯৪-১০৬৩) এবং ইসমাইল বিন নাগদিলার মধ্যে। ইবনে হাযম (রহ.) সে বিতর্কে ইহুদি ধর্মের অসারতা স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। পরে একটা স্বতন্ত্র কিতাবও রচনা করেছিলেন। সেখানেও ইহুদি ধর্মের ভ্রান্তির বিভিন্ন দিক ও ইসমাইল বিন নাগদিলার সাথে হওয়া মুনাযারার বিবরণও ছিল।

আন্দালুসের ইহুদিরা চিকিৎসাবিদ্যাকে বেশি গুরুত্ব দিতো। কারণ এটাই ছিল সে সময় শাসক এবং ক্ষমতাধারীদের কাছাকাছি যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ। এর সাহায্যে তারা বড় বড় সরকারী পদেও আসীন হতো।

= আসলে ইহুদিরা সব সময় বেশ সংঘবদ্ধভাবেই ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে এসেছে। তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে গেলে তারা চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আর প্রকাশ না পেলে অন্যদের মাথায় চেপে বসেছে।

এটা আমরা সেই প্রাচীন কাল থেকেই দেখে আসছি। নবীজি (সা.) এর যুগেও এমনটা ছিল।

আন্দালুসে ইসলাম প্রবেশের সময় হিব্রু ভাষা ছিল অত্যন্ত অবহেলিত। বেশিরভাগ ইহুদীই তাওরাতের ভাষ্য বুঝতে পারতো না। তাদের সিনাগগে মূল তাওরাতের বদলে আরামীয় ভাষায় অনুদিত তাওরাত পড়া হতো।

আন্দালুসে ইসলামের আগমনের পর, ইহুদীরা মুসলমানদের সংস্পর্শে এল। আরবী ভাষার সংস্পর্শে এল। আরবী ভাষার ব্যাকরণ (নাহ-সরফ) শিখল। তারা দেখল মুসলমানরা কিভাবে আরবী চর্চা করে। আরবরা তাদের ভাষাকে কতোটা ভালোবাসে। তাদের কুরআনকে কী পরিমাণে শ্রদ্ধা করে।

তারাও উদ্বুদ্ধ হলো। হিব্রু ভাষাচর্চা শুরু করলো। আরবী ব্যাকরণের মতো হিব্রু ভাষার জন্যেও ব্যাকরণ প্রণয়ন করলো।

অবশ্য হিব্রু ভাষার ব্যাকরণের উৎপত্তি ঘটে ইরাকে। সা'দিয়া বিন ইউসুফ (৮৯২ খি:) এর মাধ্যমে। তবে হিব্রু ভাষার বিকাশ ও উৎকর্ষতা আসে আন্দালুসে।

মানাহীম বিন সার্কক (৯১০-৯৬০ খি:)। ইনিই সর্বপ্রথম হিব্রু অভিধান প্রণয়ন করেন। মুহাবরীত। এই অভিধানে বাইবেলের সমস্ত শব্দই আনা হয়েছিল। মধ্যযুগে ইউরোপের ইহুদীরা এই অভিধানের সাহায্যেই হিব্রুচর্চা করতো।

স্পেনে অষ্টম উমাইয়া খলীফা ছিলেন আবদুর রাহমান নাসির (তয়)। তার একজন উযীর ছিলেন হাসদাই বিন শাবরুত। মানাহীম বিন সার্কক এই উযীরের প্রধান সেক্রেটারী ছিলেন।

মুসলমানদের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠে, মুসলমানদের খেয়ে পরে, আজ মুসলমানদের নিধনে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে এই অভিশপ্ত জাতিটা। বাংলা প্রবাদবাক্যই ওদের জন্যে শতভাগ উপযুক্ত:

= তোমারে বধিবে যে, গোকূলে বাড়িছে সে।

কোনও ক্ষমতাই চিরদিন থাকে না। টেকে না। স্থায়ী হয় না। সেটা বাংলাদেশে হোক আর রাশিয়াতে হোক আর আমেরিকায় হোক আর ইসরাইলেই হোক।

ইসরাঈলের পতন আর বেশিদিন নেই। ঘনিয়ে এসেছে। সন্নিহিত। অতি নিকটে। একটা হিশেব কষি:

- = আমরা যদি অতীত পানে তাকাই, দেখবো, মিসরের শীখা সালতানাত উবাইদী (ফাতেমী) বিলুপ্ত হয়েছিল শাম (সূরিয়া)-এর দিক থেকে আসা মুজাহিদ (সালাহুদ্দীন আইয়ুবী)-এর মাধ্যমে।
- = বায়তুল মাকদিস মুক্তির সূচনা হয়েছিল শামে।
- = এ থেকে বোঝা যায়, বায়তুল মুকাদাসের নাড়ী ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শাম (সূরিয়া)-এর সাথে।
- = সুতরাং দিমাশক জয় না হলে, আলকুদস জয় হবে না।
- = জামে' উমাবী জয় না করলে আল-আকসা জয় করা যাবে না।
- = বর্তমান ও অতীতের সিরীয় শাসকদের হাতে যত ফিলিস্তিনি মুহাজির শহীদ হয়েছে, তার সংখ্যা ইসরাঈলের ইহুদিদের হাতে শহীদ হওয়া ফিলিস্তিনিদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।
- = এজন্যই দিমাশক জয় করলে শুধু বায়তুল মুকাদাস নয়, নিরীহ উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিরাও মুক্তি পাবে।

আর এটা কি বলে দিতে হবে:

- = কালিমাখচিত কালো পতাকা তিনদিক থেকে দিমাশকের ঘাড়ে তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলছে!
- = ইয়া আকসা! আমরা আসছি। দিমাশকের পরপরই। আর বেশিদিন নেই।
- = সাবরান ইয়া আকসা! নাহনু হাদিরুন।
- = লাক্বাইক ইয়া আকসা! লাক্বাইক! লাক্বাইক!

## তৃতীয় পর্ব

দিনলিপি-১৯০  
(১৪-০৫-২০১৫)

ইসলামপূর্ব আন্দালুসের অবস্থা।

নামকরণ:

তখনকার স্পেনে কিছু বর্বর গোত্র বাস করতো। এরা মূলত স্পেনে এসেছিল উত্তরের স্ক্যান্ডিনিভিয় দেশ সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে ইত্যাদি দেশ থেকে। এরা বর্বরের মতো এসে, স্পেনের ভূমি দখল করে বাস করতে শুরু করেছিল। কারো কারো মতে

এরা এসেছিল জার্মানি থেকে।

এই উদ্বাস্তু নব আগন্তুক অভিবাসীদেরকে ভ্যাভাল নামে ডাকা হতো। এদের নামের সাথে মিলিয়েই স্পেন ‘ভ্যাভালেসিয়া’ নামে পরিচিতি পেতে থাকে। আস্তে আস্তে পরিবর্তিত রূপ দাঁড়ায় আন্দুলীসিয়া তারপরে আন্দালুস।

এ ভ্যাভাল গোত্রগুলো ছিলে অত্যন্ত অসভ্য-বর্বর। ইংরেজিতে ভ্যাভাল শব্দের অর্থও তাই। ভ্যাভালরা ছিল যাযাবর। এক জায়গায় বেশিদিন স্থির হয়ে থাকতো না। তারা আন্দালুস ছেড়ে চলে গেলো। তাদের পরে অন্য খ্রিস্টান জাতি স্পেনের শাসনক্ষমতায় এল, তাদেরকে বলা হতো গথ। মুসলমানদের সাথে এই গথিকদেরই যুদ্ধ হয়েছে।

আমরা আন্দালুস হিশেবে যে দেশকে চিনি-জানি, সেটা শুধু আজকের স্পেনই নয়, বর্তমানের পর্তুগালও আন্দালুসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরো অঞ্চলটাকেই বলা হতো: আইবেরীয় উপদ্বীপ। আয়তন প্রায় ছয় লক্ষ বর্গকিলোমিটার।

আইবেরীয় উপদ্বীপ ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অনেকটা ত্রিভুজাকৃতির। পূর্বদিকে ক্রমশ সংকীর্ণ হতে হতে কোণের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম দিকে ক্রমশ প্রশস্ত।

মরক্কো থেকে বার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। দুই দেশের মধ্যে ছোট্ট একটা প্রাণালী। জিব্রাল্টার প্রাণালী। যার মূল উচ্চারণ হলো: জাবালুত তারিক। তারিক বিন যিয়াদ (রহ.) নামে।

পিরেনিজ পর্বতমালা আন্দালুস এবং ফ্রান্সের মাঝে অন্তরায় হয়ে আছে। এই পর্বতশ্রেণী পূর্ব - পশ্চিমে প্রায় তিনশত মাইল বিস্তৃত।

আন্দালুসের ভূমধ্যসাগর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে বেষ্টিত করে আছে। দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বেষ্টিত করে আছে আটলান্টিক মহাসাগর। অর্থাৎ তিনদিক থেকেই আন্দালুস পানি দিয়ে বেষ্টিত। আরব ঐতিহাসিকগণ এজন্য আন্দালুসকে জাযীরায় আন্দালুস বলতো।

পিরেনিজ পর্বতমালার কারণে, ওপর থেকে দেখলে মনে হয়, আন্দালুস ইউরোপ থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে আর মরক্কোর দিকে মুখ করে আছে। এজন্য আরব ভূগোলবিদগণ আন্দালুসকে আফ্রিকা মহাদেশের একটি বর্ধিতাংশ বলেই ধরে এসেছেন। তদুপরি, আন্দালুসের ভৌগোলিক অবকাঠামো, প্রাণীবৈচিত্র্য, উদ্ভিদরাজি বাহ্যিকভাবে অনেকটাই আফ্রিকার মতো।

দু’টি প্রশ্ন মনে আসে:

এক: মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের অবস্থা কেমন ছিল ?

দুই: মুসলমানরা কেন স্পেনে অভিযান পরিচালনা করলেন ?

প্রথমে দেখা যাক স্পেনের অবস্থাটা। আমরা চারটা দৃষ্টিকোন থেকে অবস্থাটা বিবেচনা করি :

ক: সামাজিক

খ: রাজনৈতিক



গ: অর্থনৈতিক

ঘ: ধর্মীয়

সামাজিক অবস্থা: মুসলমানদের আগমনের পূর্বে, স্পেনের বেশ কিছু শ্রেণী ছিল। মূলত ছিল দুইটা শ্রেণী। ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীন। এছাড়া বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে:

১: শাসকশ্রেণী। এরা বলতে গেলে, দেশ ও দেশের জানমালের মালিক ছিল। গীর্জা ছাড়া অন্য কারও তাদের সামনে মুখ খোলার সাহস হতো না।

২: যাজক সম্প্রদায়। তারা ছিল খুবই শক্তিশালী। নাগরিক নানা সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত। গথ রাজারা ছিল ধার্মিক। তাদের ওপর পুরোহিতশ্রেণীর বেশ প্রভাব ছিল। রাজাদের বদান্যতায় যাজক সম্প্রদায় অচেল ধন-সম্পদের মালিক ছিল।

৩: সামন্ত রাজা বা জমিদারশ্রেণী। এদের কাজ ছিল রাজার ভোগ-বিলাসের উপায়-উপকরণ যোগান দেয়া।

৪: মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা ছিল মূলত ভূস্বামী। তারা অনুর্ধ্ব এক একর জমির মালিক হতে পারত। এই জমি ছিল হাঙ্গান্তুরের অযোগ্য। অন্য কাউকে দান করতে পারতো না। বিক্রী করতে পারত না।

খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির কারণে শস্য উৎপন্ন না হলেও নিয়মিত কর ঠিকই আদায় করতে হতো।

৫: ভূমিদাস ও ক্রীতদাস। এরা ছিল সমাজের সবচেয়ে নিম্নশ্রেণী। ভূমিদাসকে বলা হতো সার্য। এরা ঠিক দাস নয়, তবে এরা হলো মধ্যবিত্ত ও জমিদারদের মালিকানাধীন জমি-জিরেতের বাঁধা চাষী। এই শ্রেণী বিয়েশাদী করতে পারতো।

আর দাসেরা ছিল পুরো বন্দী। তাদের স্বাধীন কোনও জীবন ছিল না। বিয়েশাদীও নিজ থেকে করতে পারত না।

রাজনৈতিক অবস্থা:

১: রাজপরিবারের অন্তর্কোন্দল: তখন শাসক পরিবারে ছিল প্রচণ্ড অন্তর্কোন্দল। রাজা ছিল রডারিক। সে তার পূর্ববর্তী রাজা উইটিজাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। উইটিজার পুত্র ওয়াচিলাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তখন থেকেই দেশের মধ্যে চাপা অসন্তোষ শুরু হয়।

২: রাজাদের কাজ ছিল একটা, প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা। তাদের করভারে প্রজারা পর্যুদস্ত। প্রজারা মনে মনে রাজাদের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছিল।

৩: স্পেনে একটা প্রথা ছিল, সামন্ত রাজা ও জমিদারদের পুত্র-কন্যাদেরকে রাজার কাছে জিম্মী হিশেবে রাখা হতো। এ নিয়েও ক্রমে ক্রমে চাপা ক্ষোভ জন্মছিল।  
এমনি এক রাজা উইটজার-এর কন্য ফ্লোরিডা ছিল রাজা রডারিকের কাছে জিম্মী। রডারিক তার সাথে দুর্ব্যবহার করে। এটা নিয়েও একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

৪: গথিক রাজারা ছিল অনেক ক্ষেত্রে যাজক দ্বারা প্রভাবিত। গীর্জার স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় রাজারা যাজকদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়তেন।

৫: দক্ষ সেনাবাহিনীরও অভাব ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে রাজার পর্যাপ্ত সামরিক শক্তি ছিল না।

অর্থনৈতিক অবস্থা:

১: রাজাদের মূল আয়ই ছিল প্রজাদের কর। নানাভাবে শোষণ করেই কর আদায় করা হতো।  
২: সেচ ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে কৃষিকাজও অতটা সবল-সচল ছিল না। রাজাদের উদাসীনতাই মূলত দায়ী।

৩: পশুপালনও ছিল অনেকের জীবিকার অন্যতম ভিত্তি।

৪: যাতায়াত ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক মন্দাভাব নেমে আসে। নিরাপত্তার অভাবে কেউ ব্যবসার প্রতি আগ্রহ বোধ করতো না।

ধর্মীয় অবস্থা:

১: স্পেনে ছিল খ্রিস্ট ধর্মেরই প্রাচল্য। ইহুদিরা ছিল চরম অবহেলিত। নির্যাতিত। ৬৯৪ সালের দিকে পরিচালিত এক গণহত্যায় বিপুল সংখ্যক ইহুদিকে হত্যা করা হয়।  
গথিক রাজা সিসিবিথ প্রায় নব্বই হাজার ইহুদিকে খ্রিস্টধর্মে জোরপূর্বক দাখিল করে।  
মোটকথা পুরো স্পেনই ছিল ধর্মীয় জবরদস্তি আর অত্যাচারের দেশ।

পুরো অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করলে দেখা যায় ও বোঝা যায়, স্পেন তখন নতুন কিছুই অপেক্ষায় প্রস্তুত। পরিবর্তনের জন্যে উন্মুখ। অধীর। একটু নাড়া দিলেই হবে, টুপ করে পাকা ফল এসে কোলে পড়বে। জনগন সাড়া দিবে।

আমাদের পরের বিষয় হলো:

--- মুসলমারা স্পেনে কেন গেলেন?

## চতুর্থ পর্ব

দিনলিপি-৩১০

(০৭-০৯-২০১৫)

### মরিশ্কা-সিরিয়ান

-----  
ইউরোপ হঠাৎ দয়ালু হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না। তাদের মানবতাবোধ হঠাৎ করে চড়চড় করে বেড়ে গেল?

= ইরাক, আফগানিস্তান, বসনিয়া-হার্জেগোভিনাতে যখন লাখ-লাখ শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল তখন তাদের মানবতার এই ‘ফেক আইডি’ কোথায় ছিল?

.  
= ইরাকে-আফগানিস্তানে- বসনিয়াতে যখন হাজার-হাজার পরিবার উদ্ধাস্ত হয়েছিল, তখন তাদের মানবিকতা কোথায় ছিল?

.  
= তারা যখন মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন চালায়, শহরকে শহর বিধ্বস্ত করে দেয়, তখন তাদের দয়াবোধ কোথায় থাকে?

.  
= ন্যাটো জোট দিয়ে যখন নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করা হয়, মুসলিম জনপদগুলোতে, তখন তাদের সভ্যতা কোথায় থাকে?

.  
= তারা বলে, প্রতিবেশিরা সিরিয়ানদেরকে জায়গা দিচ্ছে না। এটা চরম মিথ্যা। তারা এটা কেন ভুলে যায়, অসংখ্য সিরিয়ান মিসরে আশ্রয় নিয়েছে, সৌদিতে আশ্রয় না নিলেও, তারা শুরু থেকেই সাহায্য করে আসছে সেই কবে থেকে, যদিও বিষয়টা স্বার্থের কারণেই করছে। জর্দান-মরক্কো-সুদান-তুনিস-জাযায়ের-লুবনান-মিসর-তুরস্কেও অগণিত সিরিয়ান আশ্রয় নিয়েছে।

.  
তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলা যায়, তেলসমৃদ্ধ একটা দেশও উদ্ধাস্তদের আশ্রয় দিতে এগিয়ে আসে নি। সৌদি, আবুধাবি-দুবাই, কুয়েত, কাতার এদের কেউই সরাসরি এগিয়ে আসেনি।

.  
ইউরোপ যেভাবে বলছে, মুসলিম শাসকরা সিরিয়ানদেরকে মোটেও আশ্রয় দেয়নি, এটা ডাহা মিথ্যা। তবে হ্যাঁ, আরব রাষ্ট্রগুলো চাইলে, বিশেষ করে সৌদি চাইলে, একাই সিরিয়ানদের সমস্যা সমাধান করতে পারে। তাদেরকে আশ্রয় দিতে পারে। তারা এটা করে নি। তারা তাদের কল্পিত সীমাকে নিজেদের দেশ বলে ধরে নিয়েছে।

ইউরোপ যতই দরদ দেখাক, তারা আদতেই ইসলাম ও মুসলমানকে পছন্দ করে না। তারা মূলত খ্রিস্টান বানানোর জন্যেই এটা করছে। এবং প্রাপ্ত খবরে দেখা গেছে, তারা ইতিমধ্যে উদ্বাস্তুদেরকে খ্রিস্টান বানানোর কাজ শুরুও করে দিয়েছে।

স্লোভাকিয়া তো সরাসরি ঘোষণাই দিয়ে বসেছে, তাদের দেশে শুধু খ্রিস্টানরাই আশ্রয় নিতে পারবে।

কেমন হতো, এবার হাজীরা যারা নফল কুরবানী করবেন, তাদের টাকাটা সংগ্রহ করে, সিরিয়ানদের জন্যে ব্যয় করা হলে!

কেমন হতো, যদি আরব দেশগুলো তাদের খালি পড়ে থাকা বিরান মরুভূমিতে সিরিয়ানদের আশ্রয় দিতো। সারা বিশ্ব থেকে সাহায্য নিয়ে, সিরিয়ানদের মাঝে বিলিয়ে দিতো।

কেমন হতো, আরব দেশগুলো তাদের দেশ থেকে অমুসলিম প্রবাসী শ্রমিকদের বের করে, সিরিয়ানদেরকে চাকুরি দিতো?

ইউরোপের এত অভিনয় না করে, শুধু একটা কাজ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। নিমেষেই। তারা বাশশার আসাদকে গোপন সমর্থন দান বন্ধ করে দিলেই হয়।

বাশশার সুনী মুসলমানদের ওপর যে অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে, তার সামনে ইসরাইলের এরিয়েল শ্যারন, মোশে দায়ান, নেতানিয়াহুর সম্মিলিত পাপও নসি়।

আজকের সিরিয়া আর অতীতের আন্দালুসের মাঝে খুব একটা পার্থক্য নেই।

মরিস্ক মুসলমান:

তারা অতীতে স্পেন থেকে কোনও রকমে জান নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের ইনকুইজিশন (ধর্মীয় আদালত) থেকে বাঁচতে।

সিরিয়ান:

আজ সিরিয়ানরা আরব শাসকদের থেকে পালিয়ে ইউরোপে যাচ্ছে।

= দুইটা অদ্ভুত মিল লক্ষ্যণীয়:

ক: মরিস্ক ও সিরিয়ান, উভয়দলকেই কিন্তু জীবন বাঁচানোর জন্যে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে হয়েছে। মরিস্করা ইউরোপ থেকে পাড়ি দিয়ে আরবে এসেছিল, আর সিরিয়ানরা আরব থেকে পাড়ি দিয়ে



ইউরোপ যাচ্ছে।

খ: আগেও মুসলিম শাসকরা কার্যকরভাবে মরিস্ক মুসলমানদের বাঁচাতে এগিয়ে আসে নি। এখনো মুসলিম শাসকরা সিরিয়ানদেরকে বাঁচাতে এগিয়ে আসছে না।

জীবনের প্রয়োজন!

--

বিজেতা/আশ্রিতা

---

= মুসলমানরা ছিলো ইউরোপের বিজেতা। এখন হয়ে পড়েছে ইউরোপের আশ্রিতা। কেন এমন হলো?

= মুসলমানরা ইউরোপ বিজয়ের সূচনা করেছিল, সেকালের সিরিয়া থেকে। আজ আবার সেই সিরিয়ানরাই ইউরোপে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কেন এমন হলো?

= আন্দালুসের পতন হয়েছে ১৪৯২ সালে। এটা শুধু একটা ঘটনা ছিল না। সাথে সাথে জন্ম দিয়েছিল অসংখ্য ঘটনার:

(১): আন্দালুস পতনের সাথে সাথে পতন হয়েছিল, মুসলমানদের স্বর্ণযুগের।

(২): আইবেরীয় উপসাগর, ভূমধ্যসাগরের একচ্ছত্র মুসলিম আধিপত্য শেষ হয়ে গিয়েছিল।

(৩): বিশ্বে ছিল একটাই পরাশক্তি। এখন শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আগে শুধু মুসলমানরাই বিশ্বশক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এখন স্পেন-পর্তুগালকে ঘিরে ক্যাথলিকদের একটা শক্তিজোট, আরেকটা উসমানী খলীফাগনের শক্তিজোট।

(৪): বিশ্বে নতুন একটা পরিভাষা চালু হয়েছিল। মরিস্ক। স্পেনের বাকী থাকা মুসলিম বা ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদেরকে মরিস্ক বলা হতো। ১৬০৯ সালে স্পেনসম্রাট তৃতীয় ফিলিপ ঘোষণা দিয়েছিল:

-দেশ থেকে সমস্ত মরিস্ককে তাড়াতে হবে। তাদেরকে এদেশে থাকতে দেয়া হবে না।

(৫): পাশাপাশি 'আধুনিক যুগ' পরিভাষাটাও তখন থেকে প্রবর্তিত হয়েছিল।

(৬): ইউরোপ ব্যাপক হারে, তাদের দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে খ্রিস্টান বানাতে শুরু করে।

(৭): ছিল একটা মুসলিম খিলাফাহ। সেখান থেকে মুসলমানদেরকে উৎখাত করার পর, পোপ একটা রাষ্ট্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল: স্পেন ও পর্তুগাল।

(৮): স্পেনের কাশতালা রাজ্যের খ্রিস্টান শাসক প্রথম বারের মতো মুসলিম বিতাড়ন ও ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতার রাজনীতি শুরু করেছিল, কালক্রমে সেটা বড় বড় হতে ১৯৪৮ সালে ফিলাস্টীনে ইহুদিদের হাতে এসে পূর্ণতা পেয়েছে।  
আশ্চর্যের বিষয় হলো, তখন কিন্তু স্পেন থেকে মুসলমানদের পাশাপাশি ইহুদিদেরকেও তাড়ানো হয়েছিল। তারাও চরম নির্যাতন সয়ে বিতাড়িত হয়েছিল। সেই তারাই আরেকটা দেশের জবরদখল নিয়ে ভূমিপুত্রদেরকে ভিটেমাটিছাড়া করেছিল।

(৯): স্পেনের মতো হুবহু ঘটনা ঘটেছে ২০০৩ সালে ইরাকে। সুন্নী মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সেখানে। বাগদাদে। মার্কিন আগ্রাসনের পর, সুন্নীরা সেখানে হয়ে পড়েছে দুর্বল। এখন অবশ্য আবার অবস্থা পাল্টাচ্ছে। সিরিয়াতেও সুন্নীরা ছিল শক্তিশালী। হাফেজ আল আসাদ ক্ষমতা দখল করে, সুন্নীদেরকে বানিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

(১০): ২০১১ সালে আবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। যেমনটা ঘটেছিল স্পেনে। দামেশকে সুন্নীদের ওপর নেমে এল চরম নির্যাতন। তারা ঘরবাড়ি ছেয়ে সরে পড়তে শুরু করলো। প্রতিষ্ঠিত হলো ইরানি-সাফাভি আধিপত্য। আলাভী শী'আদের অভয়ারণ্য।

(১১): আন্দালুসের মুসলমানরা শিকার হয়েছিল নির্যাতন আর খ্রিস্টানকরনের, আর এখন সুন্নীরা শিকার হচ্ছে, শী'আকরনের।

(১২): আন্দালুসের মুসলমান আর সিরিয়ানদের মধ্যে বড় একটা পার্থক্যও আছে, আন্দালুসীয়রা সাগর পেরোলেই একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু এখনকার সিরিয়ানরা সাগর তো দূরের কথা, সামান্য হেঁটে সীমান্ত পার হয়েও কোনও আশ্রয় পাচ্ছে না।

ওলামায়ে সু:

এত কিছু পরও, কিছু কিছু সিরিয়ান ও আরবের পোষা আলেম, ফতোয়া দিয়ে থাকেন, শাসক যেমনই হোক, তাদের বিরুদ্ধে বের হওয়া ঠিক নয়। তারা স্বপক্ষে উদ্ধৃতি দেয় ইমাম আহমাদ বিন হাম্মলের (রহ.)। তিনি নাকি শাসকের বিরুদ্ধে বের না হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

আমরা বলবো:

এক: ইমাম আহমাদ (রহ.) এর সব কথা কি আমরা মানি? নাকি যারা উদ্ধৃতি দিচ্ছে তারা মানে? তিনি ছাড়াও তো আরও ইমাম আছেন!

দুই: হুসাইন (রা.) ইয়াযিদ বিন মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে বের হন নি?

তিন: আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ইয়াযিদেৰ বিৰুদ্ধে বেৰ হন নি? তিনি ইয়াযিদকে বাইয়াত দিতেও অস্বীকাৰ কৰেছিলেন।

চার: সায়ীদ ইবনে জুবায়েৰ (ৰহ.) উমাইয়াদেৰ বিৰুদ্ধে বেৰ হয়েছেন। ইবনে আস‘আসকে বাইয়াত দিয়েছেন।

পাঁচ: বলা হয়ে থাকে, ইমাম আ‘যম আবু হানীফা (ৰহ.)ও আব্বাসী খলীফা আবু জা‘ফৰ মনসুৰেৰ বিপৰীতে বাইয়াত দিয়েছিলেন মুহাম্মাদ নাফসে যাকিয়্যাহ (পবিত্ৰ আত্মা)কে।

ছয়: য়ায়েদ বিন আলি বিন য়ায়নুল আবেদীন (ৰহ.) বেৰ হয়েছিলেন উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকেৰ বিৰুদ্ধে।

সাত: আৰ আব্বাসীরাও তো উমাইয়াদেৰকে হটিয়েই, নিৰ্মমভাবে নিৰ্মূল কৰে ক্ষমতায় বসেছিলেন?

যাৰা সিরিয়ান উদ্বাস্তুদেৰকে জায়গা দিছে না। সেসব শাসককে বাঁচানোৰ জন্যে যে আলিমরা ফতোয়া দিছেন, তাৰেৰ হিদায়াতেৰ জন্যে দু‘আ কৰা ছাড়া আৰ কিইবা কৰাৰ আছে?

alaminn5g

## পঞ্চম পর্ব

দিনলিপি-৩৩১

(২৮-০৯-২০১৫)

আশা ও নিরাশা

-----

আজ থেকে আটশ বছরেরও আগে, মুসলিম ইতিহাসে একটা চরম লজ্জা ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। সেটা বলার আগে, আমরা একটু গৌরবময় অধ্যায়কে জানি। তাহলে শোকটা গায়ে কম লাগবে।

-

ইংল্যান্ডের রাজা তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন:

-আমি আপনার অনুগত সেবক।

.

তার আমলেই বিশ্ব প্রথমবারের মতো দেখে, বয়স্কদের জন্যে বিশেষ রাষ্ট্রীয় সুবিধা।

.

তিনি ইউরোপীয় ইতিহাসের গতিপথটাই বদলে দিয়েছিলেন।

.

মুসলমানরা তখন শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। দলাদলি-হানাহানিতে লিপ্ত ছিল। তাদের পতন ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। এমন নাযুক পরিস্থিতিতে ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিলেন। বয়েস তখন একুশ। বদলে গেল দৃশ্যপট। উল্টে গেল আন্দালুসের গতিপথ। তিনি হলেন আবদুর রাহমান আননাসির। সপ্তম খলীফা। ৯১২-৯৬১ ইসারী।

.

তিনি দায়িত্ব নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন:

এক: জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে ব্যাপকতর করে তুলেছিলেন। কর্ডোভাকে পরিণত করেছিলেন জ্ঞানের শহরে। পুরো ইউরোপ থেকে জ্ঞানপিপাসুরা দলে দলে এ-শহরে আসতো। আগত প্রতিটি ছাত্রের জন্যেই থাকতো নিয়মিত মাসোহারা।

.

দুই: নিরক্ষরতা দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

.

তিন: কর্ডোভা মসজিদকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। সেটা পরিণত হয়েছিল সেকালের সর্ববৃহৎ মসজিদে।

.

চার: জনসংখ্যার বিচারে, কর্ডোভা স্বীকৃতি পেয়েছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে। প্রথম স্থান ছিল



বাগদাদের। তিনি কর্ভোভাতে তিন হাজার মসজিদ নির্মান করেছিলেন।

পাঁচ: তার আমলে বিশ্বে প্রথম বারের মতো রাতের বেলা, রাস্তাগুলোতে আলোকায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

ছয়: তার আমলে, ইউরোপে প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত হাসপাতাল, উন্মুক্ত পাঠাগার, বিনামূল্যে চিকিৎসা, বিনামূল্যে শিক্ষার প্রথা চালু করা হয়।

সাত: ইউরোপে তিনিই প্রথম বৃদ্ধাশ্রম নির্মান করেন। পশুপাখির জন্যে অভয়ারণ্য তৈরী করেন। এসব কাজ তদারক করার জন্য দক্ষ লোকবল নিয়োগ করেন।

আট: যুদ্ধাঙ্গনির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন। সামুদ্রিক বন্দন নির্মান করেন। ইউরোপের সর্ববৃহত সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। পুরো ইউরোপ থেকেই তার দরবারে উপহার-উপঢৌকন আসতেই থাকতো।

নয়: গড়ে তোলেন ‘মদীনাতে যাহরা’। বিশ্বের সুন্দরতম শহর। তিনটা স্তরবিশিষ্ট। সর্বোচ্চ স্তরে ছিল প্রাসাদ। দ্বিতীয় স্তরে ছিল বাগ-বাগিচা। তৃতীয় স্তরে ছিল বাজার-মসজিদ।

দশ: নির্মান জগদ্বিখ্যাত কর্ভোভা-সেতু। যা আজো বিদ্যমান আছে।

তিনি ছিলেন মুতাকী। পরহেযগার। মুজাহিদ। দক্ষপ্রশাসক।

আন্দালুসে ‘ইমারাহ’ নামে শাসন শুরু করেছিলেন আবদুর রাহমান আদদাখিল। ৭৭৫ সালে। নানা চারাই উৎরাই পেরিয়ে সেটা শেষ হয়েছিল ১০৩১ সাল পর্যন্ত।

শেষের দিকে আন্দালুস ভাগ হয়ে গিয়েছিল ২২টা নগর রাষ্ট্রে। মজার ব্যাপার হলো, উসমানি খিলাফাহ ভেঙে তৈরী হওয়া আরব রাষ্ট্রও বর্তমানে ২২টা।

বাইশটা নগর রাষ্ট্রের যুগকে বলা হয় তাওয়ায়েফ যুগ। শাসকদেরকে বলা হয় ‘মুলুকুত তাওয়ায়িফ’। এমনই একটা শহর ছিল ‘ভ্যালেনসিয়া’। ১২৩৮ সালে এ-সুন্দর শহর মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

এর বেশি লেখা সম্ভব হলো না। কষ্ট আর কষ্ট।।

## প্রশ্নোত্তরে আন্দালুস

১/ মুসলিমরা স্পেন কত বছর শাসন করে?

উত্তরঃ ৭৮১ বছর।

২/ কত সালে মুসলিমরা স্পেন বিজয় করে এবং কত সালে পতন ঘটে?

উত্তরঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর ৮০ বছরের মাথায় ৭১১ সালে মুসলিমরা স্পেন বিজয় করে।

১৪৯২ সালে মুসলিমদের আন্দালুসের পতন ঘটে।

৩/ আন্দালুসের প্রথম শাসক কারা?

উত্তরঃ উমাইয়া খলীফাদের অধীনে স্পেন বিজয় হয়। (৭১১-৭৫৬) তাদের ওয়ালি বা গভর্নররা স্পেন শাসন করতেন। ৭৫৬ সালে আব্দুর রহমান নিজেকে স্বাধীন আমীর ঘোষণা করেন।

৪/ কত বছর আন্দালুস উমাইয়া খিলাফাতের প্রদেশ ছিল?

উত্তরঃ ৩৯ বছর। (৭১১-৭৫০)

৫/ উমাইয়া খিলাফাতের অধীনে আন্দালুসের ওয়ালি বা গভর্নরদের তালিকা দাও?

উত্তরঃ ৭১১ থেকে ৭৫৬ সাল পর্যন্ত দারুল খিলাফাহর অধীনে ওয়ালিগণ দ্বারা আন্দালুস শাসিত হয়। নিম্নে ওয়ালিদের তালিকা প্রদান করা হলঃ

তারিক বিন জিয়াদ (৭১১-৭১২)

মুসা বিন নুসাইর (৭১২-৭১৪)

আব্দুল আজিজ বিন মুসা (৭১৪-৭১৬)

আইয়ুব বিন হাবিব আল-লাখমী (৭১৬)

আল হুর বিন আব্দুর রহমান সাকাফি (৭১৬-৭১৮)

সামহ বিন মালিক খাওলানী (৭১৯-৭২১)

আব্দুর রহমান আল গাফিকি (৭২১-৭২২) (৭৩০-৭৩২)

আনবাসা বিন সুহাইম কালবী (৭২১-৭২৬)

উয়রা বিন আব্দুল্লাহ আল ফিহরী (৭২৬)

ইয়াহিয়া বিন সালমান কালবী (৭২৬-৭২৮)

হুয়াইফা বিন আহওয়াস কায়সী (৭২৮)

উসমান বিন আবি নিস'আ আল কাস'আমী (৭২৮-৭২৯)

হায়সাম বিন উবাইদ কিলাবী (৭২৯-৭৩০)

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আশযায়ী (৭৩০)

আব্দুর রহমান আল গাফিকি (৭৩০-৭৩২)

আব্দুল মালিক বিন কাতান ফিহরী (৭৩২-৭৩৪)

উকবা বিন হাজ্জাজী (৭৩৪-৭৪০)

আব্দুল মালিক বিন কাতান ফিহরী (৭৪০-৭৪২)

বালজ বিন বিশর কুশাইরী (৭৪১-৭৪২)

ছালাবা বিন সালামা আমিলী (৭৪২-৭৪৩)

আবুল খাতার আল হুসাম বিন দারার কালবী (৭৪৩-৭৪৫)

ছুওয়াবা বিন সালামা গুদামি (৭৪৫-৭৪৬)

আব্দুর রহমান বিন কাতির লাহমী (৭৪৬-৭৪৭)

ইউসুফ বিন আব্দুর রহমান ফিহরি (৭৪৭-৭৫৬)

৬/ কোন খলীফার আমলে স্পেন বিজিত হয়?

উত্তরঃ উমাইয়া খলীফা প্রথম ওয়ালিদের আমলে (৭১১ সালে) ।

৭/ স্পেন বিজয়ের নায়কদ্বয় কারা?

উত্তরঃ তারিক বিন জিয়াদ এবং মুসা বিন নুসাইর।

৮/ তারিক বিন জিয়াদ কে ছিলেন?

উত্তরঃ ইফ্রিকিয়ার গভর্নর মুসা বিন নুসাইরের মুক্তদাস।

৯/ কে স্পেনের দুঃশাসন থেকে মুক্তি দিতে মুসলিমদেরকে আহ্বান জানিয়েছিল ?

উত্তরঃ রাজা রডেরিক কর্তৃক জুলিয়ানের কন্যা ধর্ষিতা হলে জুলিয়ান মুসলিমদেরকে স্পেনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

১০/ তারিক বিন জিয়াদের বাহিনীটি কাদের নিয়ে গঠিত ছিল?

উত্তরঃ নওমুসলিমদের নিয়ে।

১১/ তারিকের বাহিনীতে কত সেনা ছিল?

উত্তরঃ ৭ হাজার। মুসা পরে আরো ৫ হাজার পাঠিয়েছিলেন।

১২/ রডেরিকের বাহিনীতে কত সেনা ছিল?

উত্তরঃ ১ লক্ষ।

১২/ তারিক কর্তৃক কোন কোন অঞ্চল বিজিত হয়?

উত্তরঃ কর্ডোবা, গ্রানাডা, টলেডো ও গুয়াদালাজারা প্রভৃতি অঞ্চল।

১৩/ কে আন্দালুসের প্রথম গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ?

উত্তরঃ তারিক বিন জিয়াদ(৭১১-৭১২)।

১৪/ কাকে কুরাইশদের বাজপাখি (ফ্যালকন অব দ্যা কুরাইশ) বলা হয়?

উত্তরঃ আন্দালুসের প্রথম আমীর আব্দুর রহমান আদ-দাখিলকে।

১৫/ আব্দুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপাখি উপাধি কে দিয়েছিলেন ?

উত্তরঃ আব্বাসীয় খলীফা আল-মানসুর

১৬/ আব্দুর রহমান কত বছর শাসন করেন?

উত্তরঃ ৩২ বছর (৭৫৬-৭৮৮)

১৭/ ইউরোপের কোন প্রতাপশালী রাজা আমীর আব্দুর রহমানের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ভয়ে সন্ধি করেন?

উত্তরঃ শার্লমেন

১৮/ আব্দুর রহমানের আমলে কোন শহর সমৃদ্ধি লাভ করে ?

উত্তরঃ কর্ডোভা

১৯/ কত সাল পর্যন্ত তিনি আব্বাসীয় খলীফাদের নামে খুৎবা পাঠ জারি রাখেন ?

উত্তরঃ ৭৭৩ সাল পর্যন্ত।

২০/ আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর কে আন্দালুসের আমীর হন ?

উত্তরঃ তার পুত্র প্রথম হিশাম (৭৮৮ সালে)।

২১/ প্রথম হিশাম কোন মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় মাযহাব হিসেবে ঘোষণা করেন?

উত্তরঃ মালিকী মাযহাব।

২২/ প্রথম হিশাম তার আমলে কোন কোন বিদ্রোহ দমন করে আমিরাতকে সুরক্ষিত রাখেন ?

উত্তরঃ সারাগোসা, বার্সেলোনা, নার্বোন, সেপ্টিমেনিয়া, গ্যালেসিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে খ্রিস্টানদের বিদ্রোহ দমন করেন।

২৩/ প্রথম হিশাম কত বছর শাসন করেন?

উত্তরঃ ৮ বছর (৭৮৮-৭৯৬)

২৪/ প্রথম হিশামের মৃত্যুর পর কে আন্দালুসের আমীর হন ?

উত্তরঃ হিশামের পুত্র প্রথম হাকাম (৭৯৬ সালে)।

২৫/ প্রথম হাকাম তার আমলে কোন কোন বিদ্রোহ দমন করেন?

উত্তরঃ দুই চাচা আব্দুল্লাহ ও সুলাইমানের বিদ্রোহ, ফকীহদের বিদ্রোহ, টলেডো ও কর্ডোভার বিদ্রোহ এবং ফ্রাঙ্কদের টলেডো থেকে বিতাড়ন করেন।

২৬/ প্রথম হাকাম কত বছর শাসন করেন?

উত্তরঃ ২৬ বছর (৭৯৬-৮২২)।

২৭/ আন্দালুস আমিরাতের প্রথম তিন যোগ্য শাসক কে কে ছিলেন ?

উত্তরঃ আব্দুর রহমান আদ-দাখিল, প্রথম হিশাম এবং প্রথম হাকাম।

২৮/ কার আমলে আন্দালুস ধীরে ধীরে বিলাসিতা ও গান-বাদ্যে প্রবেশ করে?  
উত্তরঃ দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের আমলে। (৮২২-৮৫২)।

২৯/ দ্বিতীয় আব্দুর রহমান কে ছিলেন?  
উত্তরঃ প্রথম হাকামের পুত্র।

৩০/ দ্বিতীয় আব্দুর রহমান কোন ৪ জন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন?  
উত্তরঃ স্ত্রী সুলতানা তারাবা, বাগদাদ থেকে আগত এক গায়ক জিরিয়াব, নাসর নামের এক হাজিব, ফকীহদের নেতা ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া।

৩১/ যেসকল খ্রিস্টান বাসিন্দা মুসলিম ও ইসলামের প্রতি মুগ্ধ হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয় তাদের কি বলা হতো?  
উত্তরঃ মুজারাব

৩২/ কউর খ্রিস্টানরা কেন বিদ্রোহের ডাক দেয়?  
উত্তরঃ মুজারাবদের ইসলাম ও মুসলিমদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধতার কারণে।

৩৩/ দ্বিতীয় আব্দুর রহমান কত বছর শাসন করেন?  
উত্তরঃ ৩০ বছর (৮২২-৮৫২)

৩৪/ দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর কে শাসন করেন এবং কত বছর ?  
উত্তরঃ তার পুত্র মুহাম্মাদ এবং তিনি ৩৪ বছর শাসন করেন (৮৫২-৮৮৬)

৩৫/ মুহাম্মাদের কৃতিত্ব কি ছিল?  
উত্তরঃ পূর্বপুরুষের ন্যায় বহু বিদ্রোহ দমন করে আমিরাতের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন।

৩৬/ মুহাম্মাদের পর কারা আন্দালুস শাসন করেন?  
উত্তরঃ তার পুত্র মুনজির (৮৮৬-৮৮৮) এবং মুনজিরের পুত্র আব্দুল্লাহ (৮৮৮-৯১২)

৩৭/ কার আমলে আন্দালুসের আমিরাত থেকে সেভিল ও আরাগন পৃথক হয়ে যায় ?  
উত্তরঃ আব্দুল্লাহর আমলে (৮৮৮-৯১২)

৩৮/ আব্দুল্লাহর পরে কে আন্দালুসের আমীর হন?  
উত্তরঃ তৃতীয় আব্দুর রহমান (৯১২ সালে)।



৩৯/ নাসির বা স্পেনের ত্রাণকর্তা কার উপাধি ছিল?

উত্তরঃ তৃতীয় আব্দুর রহমানের।

৪০/ আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের পর কে আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ আমীর ছিলেন?

উত্তরঃ তৃতীয় আব্দুর রহমান।

৪১/ তৃতীয় আব্দুর রহমান কত বছর শাসন করেন?

উত্তরঃ প্রায় ৫০ বছর। (৯১২-৯৬১)

৪২/ কত সালে আব্দুর রহমান নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা করেন?

উত্তরঃ ৯২৯ সালে।

৪৩/ কার শাসনামলে আন্দালুসিয়া ইউরোপের সবচেয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়?

উত্তরঃ তৃতীয় আব্দুর রহমানের আমলে।

৪৪/ তিনি রাজধানী কর্ডোভা ব্যাতিত সমগ্র স্পেনকে কয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন?

উত্তরঃ ৮ টি।

৪৫/ ইতিহাসের অন্যতম সুন্দর জোহরা প্রাসাদ কার নামে এবং কত সালে নির্মাণ করেন?

উত্তরঃ স্ত্রীর নামে, ৯৩৬ সালে।

৪৬/ জোহরা প্রাসাদে কক্ষের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তরঃ প্রায় ৪০০ টি।

৪৭/ কত টাকা ব্যয় করে জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন?

উত্তরঃ ৫ লক্ষ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা)।

৪৮/ তার আমলে কর্ডোভা শহর কিরূপ ছিল?

উত্তরঃ ৩০০ মাসজিদ, ১০০ প্রাসাদ, ৩০০ হাম্মামখানা, ১৩০০ টি বাড়ি ও ৫ লক্ষ লোক বাস করতো।

৪৯/ তার আমলে রাজস্ব আয় কত ছিল?

উত্তরঃ ৬২ লক্ষ ৪৫ হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা)।

৫০/ তৎকালীন কালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী নৌবহর কার ছিল?

উত্তরঃ তৃতীয় আব্দুর রহমানের।

৫১/ তৃতীয় আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর কে খলীফা হন?

উত্তরঃ পুত্র দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১ সালে)।

৫২/ কার আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষায় আন্দালুস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান হিসেবে পরিচিত পায়?

উত্তরঃ দ্বিতীয় হাকামের আমলে (৯৬১-৯৬৭)।

৫৩/ কার মৃত্যুর পর আন্দালুসে উমাইয়া বংশের পতন শুরু হয়?

উত্তরঃ দ্বিতীয় হাকাম ৯৬৭ সালে মৃত্যুবরণ করলে নাবালক পুত্র দ্বিতীয় হিশামের আমল থেকে উমাইয়া বংশের পতন শুরু হয়।

৫৪/ কে গ্রানাডার আল-হামরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন?

উত্তরঃ দ্বিতীয় হিশামের আমলে তার কর্মচারী মুহাম্মাদ বিন আবি আমির।

৫৫/ কত সালে উমাইয়াদের চূড়ান্ত পতন ঘটে?

উত্তরঃ ১০৩১ সালে তৃতীয় হিশামের আমলে।

৫৫/ দ্বিতীয় হিশামের অযোগ্যতার সুযোগে কে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে?

উত্তরঃ হাজিব আল মানসুর।

৫৬/ কাকে দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার জন্য ১০ম শতাব্দীর বিসমার্ক বলা হতো?

উত্তরঃ হাজিব আল-মানসুরকে।

৫৭/ কর্ডোবা খিলাফাহ পতনের পর আন্দালুসের কি অবস্থা হয়?

উত্তরঃ আন্দালুস কয়েকটি তাইফাতে বিভক্ত হয় যেমন তাইফা কর্ডোভা, তাইফা সারাগোসা, তাইফা সেভিল।

৫৮/ আন্দালুসের বিখ্যাত কয়েকজন আলিমের নাম উল্লেখ কর?

উত্তরঃ কুরতুবি, ইবনে আব্দুর বার, ইবনে জুজাই, তুরতুশি প্রমুখ।

৫৯/ আন্দালুসের পৃথিবীখ্যাত কয়েকজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ কর?

উত্তরঃ বিখ্যাত সুফি দার্শনিক ইবনে আরাবী, বিজ্ঞানী ইবনে রুশদ, ইবনে হাযম, বিজ্ঞানী আব্বাস ইবনে ফিরনাস, গায়ক জিরইয়াব, সমাজতত্ত্ববিদ ইবনে খালদুন প্রমুখ।

৬০/ স্পেনে মুসলমানদের পতনের পর আনুমানিক কত বই-পুস্তক পাণ্ডুলিপির ধ্বংস সাধন করা হয়?

উত্তরঃ অসংখ্য অগণিত।

৬১/ ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া আরবি পাণ্ডুলিপির নাম উল্লেখ কর?

উত্তরঃ ধ্বংস সাধনের একাধিক প্রচেষ্টার কয়েকশ' বছর পর অরক্ষিত অবস্থায় মাত্র ১৮৫০ টি পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়েকটি হলঃ

তারিখে ফতেহাতুল আন্দালুস - ইবনুল কুতিয়া (মৃ ৭৯৯ ঈসাব্দ)। স্পেনে মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাস নিয়ে।

তারিখে ফাতহুল মিসর - ইবন আব্দুল হাকাম। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে স্পেন বিজয়ের বর্ণনাকে আলাদা করে উর্দু অনুবাদ যিকরে ফাতহুল উন্দুলুস বের হয়েছে।

তৃতীয় আব্দুর রহমান আল নাসিরের জীবনী - ইবনুল আহমার

আখবার মাজমুয়া - অজ্ঞাত লেখক। স্পেনের মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস।

আল মুকতাবিস ফি তারিখে রিজালুল আন্দালুস - আবু মারওয়ান হাইয়ান ইবনে খালাফ। ১০ খণ্ডের বৃহৎ গ্রন্থ।

আল মুজিব ফি তালখিসে আখবার আল মাগরিব - আব্দুল ওয়াহাব আল মারাকুশি। ইংরেজি অনুবাদ - হিস্টোরি অব আল-মোহেদস।

আল ইহাতা ফি তারিখে গারনাতা - লিসানুদ্দীন আল খতীব

নাফহত তীব - আল মাক্কারি

আল বায়ানুল মাগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব - ইবনে ইজারী

কিতাবুল কুযাত ফি কুরতুবাহ - খুশানী

তারিখ উলামাইল আন্দালুস - ইবনুল ফারাজি

তাকমিলাহ লি কিতাবু সিলাহ - ইবনুল আকবর আল কুজা

আল খাজিরা ফি মাহাসিনিল জাহিরা - ইবনে বাসাম। ইত্যাদি।

৬২/ আন্দালুসের বৃহৎ মাসজিদসমূহের নাম উল্লেখ কর ?

উত্তরঃ নিম্নে উল্লেখিত একটা মাসজিদও আজ আর নাই। সকল বৃহৎ মাসজিদ খ্রিস্টানরা ধ্বংস করে দিয়েছে, কিছু মাসজিদকে গির্জা বানানো হয়েছে। কিছু মাসজিদ একেবারে ভবনসহ ধ্বংস করা হয়েছে।

কর্ডোভা মাসজিদ,

টলেডোর বিখ্যাত বাব-আল-মারদুম মাসজিদ,

সেভিলের বৃহৎ মাসজিদ,

টলেডোর আল মুসতিমিম মাসজিদ,

কর্ডোভার মাদিনাতুয যাহরা আল-জামে মাসজিদ,

টলেডোর আল দাব্বাগিন মাসজিদ,

মাসজিদ আল-তাইবিন,

সারাগোসা আল জামে মাসজিদ,

মাদ্রিদ আল জামে মাসজিদ,

গ্রানাদার বৃহৎ নাসরীয় মাসজিদ,

আল-হামা মাসজিদ ইত্যাদি।

alaminn5g

# আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা কুরাইশি ঈগল খ্যাত আবদুর রহমান আদ-দাখিল

অনুবাদ ও সংযোজন : আল-জাইদি

প্রত্যেক যামানাতেই এমন কতক মহা মানবের আবির্ভাব ঘটে যারা ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি, মর্যাদা ও গৌরব পুনঃরায় ফিরিয়ে আনেন।

যখনই মুসলিম দেশসমূহ কুয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তাদের অধিকারসমূহ কেড়ে নেয়া হয়, এমনকি তাদের পরিবার-পরিজনকেও বিতাড়িত করা হয় তখনই মুসলিমভূমে বীরত্ব ও বাহাদুরী মূর্ত হয়ে উঠে।

এ-সময়েই দয়াময় আল্লাহ ঘুনে ধরা এই উম্মাহর জন্য এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করে থাকেন যিনি মুমিনদেরকে একই সুতোয় আবদ্ধ করে ইসলামের অস্তিত্বকে নতুন রূপে বিনির্মাণের মহান লক্ষ্যে উম্মাহর দাপট ও ক্ষমতা পুনঃরায় ফিরিয়ে আনবেন।

ইসলামের হারানো গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে যে-সকল মহান ব্যক্তিবর্গ কাজ থাকেন, তাদের মাধ্যমে এভাবেই মুসলিম ভূমির সীমান্ত প্রাচীর সুরক্ষিত থাকত।

আব্বাসি সাম্রাজ্য তাদের প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে বনু উমাইয়ার এমন সকল পুরুষদের হত্যা করেছে যারা খেলাফতের দাবি করতে পারে বলে তাদের সন্দেহ হয়েছে। নিজেদের ক্ষমতা পোখতা করার মানসে তাদের রক্তকে তারা হালাল মনে করেছে। তখন তাদের হত্যাযজ্ঞের নরক থেকে আত্মরক্ষা করে একজনই কেবল পালিয়ে বেঁচে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি হলেন আবদুর রহমান আদ-দাখিল রহ.। অথচ তাঁর ভাই হিশাম বিন মুআবিয়াকে তাঁর চোখের সামনেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি পালিয়ে একাকী আন্দালুসে প্রবেশ করেন। এসেই তিনি সেখানকার সকল দলকে এক পতাকাতলে সমবেত করলেন। ফলে তাঁর আমলে আন্দালুসের মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ অশ্বারোহীতে। এই বিশার বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে তিনি মুসলিম আন্দালুসের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তকে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন। বিশেষত লিওন রাষ্ট্রের হামলা থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন।

যখন আন্দালুসের মুসলিম শাসকগণ পারস্পরিক খুনখারাবিতে চরমভাবে লিপ্ত, প্রত্যেকেই নিজের জন্য একচেটিয়া রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা অধিকার করতে চাচ্ছিলো, ফলে লাঞ্ছনা, অপমান ও দুর্বলতা তাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, ইউরোপের খৃস্টান শাসকরা পর্যন্ত তাদের উপর

দুঃসাহস প্রদর্শন করে আন্দালুসের অনেক শহর দখল করে নিয়েছে, এমনকি যেই ইউরোপের শাসকরা এক সময় মুসলিম শাসকদের জিয্যা-কর প্রদান করত, এখন তারা মুসলিম শাসকদের থেকে কর নিতে আরম্ভ করে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, তখন কেউ কেউ ধারণা করতে লাগল, এই বুঝি আন্দালুস থেকে ইসলাম বিদায় নিল। পরিস্থিতি যখন এতটাই ভয়বহ, অবস্থা যখন চরম সংকটাপন্ন, ঠিক সেই মুহূর্তে আন্দালুসের হাল ধরলেন বনু উমাইয়ার বিচক্ষণ, ধীমান ও বুদ্ধিদীপ্ত ও যৌবনোচ্ছল এক বীর যোদ্ধা আবদুর রহমান আদ-দাখিল। রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি এসে আন্দালুসের চিত্র এতটাই পাল্টে দিয়েছেন যে, ইতিহাসবেত্তাগণ তাঁর সম্পর্কে এই মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন-- "যদি আবদুর রহমান আদ-দাখিল না আসতেন, তাহলে আন্দালুস থেকে ইসলামের নাম নিশানা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যেত।"

আরব উপদ্বীপ থেকে হিজরত করে মুসলিম আন্দালুসে পৌঁছার পর তিনি এমন অনেক সংকট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন যা আন্দালুসে উমাইয়াদের ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং কুদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপকারী ও লোভীদের প্রতিহত করে ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত ও সুদৃঢ় করতে বাধার সৃষ্টি করে। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে, আব্বাসি খেলাফতের শাসকগণ এবং আন্দালুসের অন্যান্য দুর্বলমনা শাসকগণ তাঁর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে গড়ে উঠা বিদ্রোহের সংখ্যা পঁচিশ ছাড়িয়ে গেছে। আব্বাসি সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে উক্ষে দেয়া বিদ্রোহটিই সবচে' ভয়াবহ ও বড় বিদ্রোহ ছিলো। কিন্তু সবকটি বিদ্রোহেরই তিনি সফল মোকবেলা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আবদুর রহমান আদ-দাখিল যখন একাকী আন্দালুসে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর চারপাশে একে একে জড়ো হতে থাকে বনু উমাইয়ার শাসকগোষ্ঠী, আমাজিগ সম্প্রদায় ও তৎকালীন আন্দালুস-প্রশাসক ইউসুফ আল-ফিহরির প্রতিপক্ষ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন। তিনি মূলত আন্দালুসে প্রবেশ করেছেন ইয়ামানীদের কৃত চুক্তির কারণে। সে-সময় তাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবুস্ সাবাহ আল-ইয়াহসাবি। তাদের মূল ঘাটি ছিলো সেকালের মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রধান ও বৃহৎ নগরী সেভিল। আবুস্ সাবাহের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর তিনি আবদুর রহমানের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। কিন্তু আন্দালুস-প্রশাসক আল-ফিহরি তাঁর আনুগত্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাঁর সহযোগী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেন। ১০৮ হিজরিতে ঐতিহাসিক মাসারা প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে তিনি বিজয় লাভ করেন।

যুদ্ধ শুরুর পূর্বে আবদুর রহমান আদ-দাখিল জানতে পারলেন, তাঁর সহযোগী সৈন্যরা পরস্পর বলাবলি করছে, যুদ্ধে আমরা হেরে গেলে তিনি তাঁর তেজোদীপ্ত ধূসর বর্ণের ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন। আর আমাদের রেখে যাবেন আল-ফিহরির নির্ঘাতের হাতে সোপর্দ করে। আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত ও তারুণ্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত এই বীর মুজাহিদ আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর তেজী ঘোড়া আবুস্ সাবাহকে দিয়ে বললেন, আমার এই ঘোড়াটি অতি দ্রুতগামী। তাতে আরোহন করে তরবারী চালনো আমার পক্ষে দুষ্কর হবে। তাই তুমি আমার



ঘোড়াটি নিয়ে যাও। আর আমাকে তোমার খচ্চরটি দাও। এরপর তিনি খচ্চরে চড়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এ চিত্র দেখে তাঁর ব্যাপারে শঙ্কিত লোকজন বলতে লাগল, এতো কোন পলাতক যোদ্ধার আচরণ হতে পারে না। এ আচরণ তো এমন বীর যোদ্ধাকেই মানায় যিনি রণাঙ্গনে মৃত্যুকে খোঁজে ফিরেন।

সে যুগের রীতি অনুযায়ী ইয়ামেনি সৈন্যরা পরাজিত আল-ফিহরির পলায়নপর সৈন্যদের পশ্চাদাবন করলে আবদুর রহমান আদ-দাখিল তাদের নিবৃত্ত করে এমন এক জ্ঞানগর্ভ বাণী উচ্চারণ করেছেন যা আজো ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। ঐতিহাসিক বাণীটি আজো তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সঠিক বিবেচনাবোধ কাজে লাগিয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের যোগ্যতার স্বাক্ষর হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, এমন শত্রুর শিকড় উপড়ে ফেল না ভবিষ্যতে যার হৃদয়তা প্রত্যাশা। তুলনামূলক কঠিন শত্রুর (মোকাবেলার সময় সহায়তা লাভের জন্য) তাকে টিকিয়ে রাখ।

আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর আলা ইবনে মুগিস আল হাজরামিকে আন্দালুস ভূমিতে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, তিনি আবদুর রহমান বিন মুআবিয়াকে হত্যা করে আন্দালুসকেও খেলাফতে আব্বাসিয়ার অধীন করবেন। কিন্তু যুদ্ধে আলা আল-হাজরামি নিহত হন এবং তাঁর বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মানসুরের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি আবদুর রহমান আদ-দাখিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা মাথা একদম ঝেড়ে ফেলে দেন। এ-সময় খলিফা তাঁকে কুরাইশি ঈগল উপাধিতে অভিহিত করেন।

হ্যাঁ, এই আন্দালুস সম্পর্কেই জোস্ট্যাফ লুবোন তার তারিখুল আরব নামক গ্রন্থে এভাবেই গুণগান গেয়েছেন, "দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশ মাইলেরও অধিক প্রশস্ত কর্ডোবার সড়কগুলো আলোতে ঝলমল করত, ঠিক সে-সময় প্যারিস ও লণ্ডনের সড়কগুলো ছিলো মাটির। এবড়োখেবড়ো। মানুষ রাতের বেলায় গাড় অন্ধকারে খুব কষ্টে চলাচল করত। আর প্রচণ্ড বৃষ্টি হলে তো পথচারিরা গভীর কাদায় ডুবে যেত।" এ-ছাড়া গ্রানাডা, ইসবেলিয়া, জারাগোজা ও টলেডো; এগুলো ছিলো সে-সব শহর যা নিস্প্রাণ অন্ধকার ইউরোপকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে তুলেছে। উক্ত শহরগুলো মুসলিম আন্দালুসের এমনসব ঘাটি যেখান থেকে মুসলিম বাহিনী সর্বগ্রাসী অন্ধকারে আচ্ছন্ন ইউরোপের প্রাণ কেন্দ্রে পৌঁছত।

হে আল্লাহ, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আমাদের মাঝে আবারো প্রেরণ করুন এই জাতীয় মহা মানবদের। এরাই হলেন সে-সব মহাবীর যাদের আবারো ফিরে আসবে আমাদের হারানো জন্মাতুল ফেরদৌস। আমিন ইয়া রব।

এই মহাবীৰে ৫৯ বছৰ জীৱিত ছিলেন। ১৯ বছৰ কেটেছে উমাইয়া খেলাফতৰ বিলুপ্তিৰ পূৰ্বে দামেশক ও ইৰাকে। ৬ বছৰ অতিবাহিত হয়েছে আব্বাসিয় বরবরতা থেকে পলায়ন করে আন্দালুসে প্রবেশ করতে। আৰ বাকি ৩৪ বছৰ আন্দালুসেৰ সিংহাসন আলোকিত রেখেছেন। অবশেষে জুমাদাল উলা ১৭২ হিজরি=৭৮৮ খৃস্টাব্দে কৰ্ডোবায় সাফল্য মণ্ডিত কৰ্মময় জীৱনেৰ আলোকধাৰা চিৱতৰে বিলীন হয়ে যায়। আন্দালুস হাৰায় তাঁৰ গৰ্বেৰ অভিৰাবক। কৰ্ডোবাতেই তিনি সমাধিস্থ হন।

০৭ জুমাদাল উখরা ১৪৩৮হিজরি=২৪শে ফেব্রুৱাৰি ২০১৮ শনিবাৰ  
"منقول عن صفحة "محمد أبو صهييب"

alammin5g

# আলিম ও ইমানি অবিচলতা!

## আতিক উল্লাহ

দিনলিপি-১৪৩৯  
(০৭-১০-২০১৮)

প্রথমে তিনটি সালতানাতের কথা সংক্ষেপে জেনে নেই। তাহলে পরিস্থিতি সহজে বোঝা যাবে।  
১: দাওলাতুল মুরাবিতীন (الدولة المرابطية)।

মুরাবিতীনের সালতানাত (১০৫৬-১১৭৪)। ইয়াহয়া বিন ইবরাহীম ছিলেন ছোটখাট একজন আমীর। ইনি মুরাবিতীন সালতানাতের মূল বীজ। তাঁর উস্তাদ শায়খ আবু ইমরান ফাসী রহ. ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু। সেনেগাল নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে শুরু হয়েছিল এই সালতানাতের কার্যক্রম। তবে মুরাবিতীন সালতানাতের মূল সূচনা হয় আবদুল্লাহ বিন ইয়াসীন রহ.-কে দিয়ে। আর উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে, ইউসুফ বিন তাশাফীন রহ.-এর হাত ধরে।

২: দাওলাতুল মুয়াহহিদীন (الدولة الموحدية)।

মুয়াহহিদীন সালতানাত (১১২১-১২৬৯)। মুহাম্মাদ বিন তাওয়ামরুত (১০৭৭-১১৩০)-এর ভাবাদর্শে বিশ্বেশাসীদের হাতে এই সালতানাতের গোড়পত্তন হয়। মূল ভিত অবশ্য ইবনে তাওয়ামরুতই গড়ে দিয়ে যায়। তবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কার্যক্রম শুরু হয় ইবনে তাওয়ামরুতের হাতেগড়া শিষ্য আবদুল মুমিন বিন আলি (১১৩৩-১১৬৩)-কে দিয়ে। এরপর আসে আবু ইয়া'কুব ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন (১১৬৩-১১৮৪)। তারপর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আবু ইউসুফ ইয়া'কুব বিন ইউসুফ (১১৮৪-১১৯৯)। তিনি মনসুর মুয়াহহেদী নামেও প্রসিদ্ধ। মুয়াহহেদী সালতানাতের তৃতীয় শাসক। তার আমলেই মুয়াহহেদীদের আকীদাগত্র ভ্রান্তিগুলো সংশোধিত হয়। তিনি ইবনে তাওয়ামরুতের মাহদি হওয়াকে নাকচ করে দেন। তার নিষ্পাপ হওয়ার আকীদাও বাতিল করেন।

৩: দাওলাতুল মেরিনী (الدولة المرينية)।

মেরিনী সালতানাত (১২৪৪-১৪৬৫)। এই রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় আবু মুহাম্মাদ আবদুল হকের উদ্যোগে। প্রথম দুই সালতানাতের ভিত্তি ছিল দ্বীন। কিন্তু এই দাওলা প্রাথমিকভাবে কোনও দ্বিনি তাকিদ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গোত্রীয় উদ্দীপনা থেকে রাষ্ট্রে সূচনা হয়েছিল।

উপরোক্ত তিনটি সালতানাতেই অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা সবাই কমবেশ আন্দালুসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আন্দালুসের মুসলমানদের সাহায্য করেছে। আন্দালুসের দুর্দিনে পাশে থেকেছে।

এবার মূল প্রশ্নে যাওয়া যেতে পারে।

৪: ইয়ায বিন মুসা (১০৮৩-১১৪৯)। তবে তিনি (القاضي عياض) কাযি ইয়ায ৪৭৬-৫৪৪ হিঃ নামেই প্রসিদ্ধ। সাবতা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষ ইয়ামানের কাহতানী বংশের ছিল।

আন্দালুসে গ্রানাডার 'বাসতায়' হিজরত করেছিলেন তারা। তারপর সেখান থেকে মরক্কোর ফাস নগরীতে। সেখান থেকে দাদা 'আমরুন' হিজরত করে 'সাবতায়' আসেন। ৮৯৩ সালে। সাবতা আগে মরক্কোর অংশ ছিল। কিন্তু স্পেন এই দ্বীপকে জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে।

৫: কাযি ইয়ায পড়াশোনা করেন এই সাবতাতেই। তারপর উচ্চতর পড়াশোনার উদ্দেশ্যে আন্দালুস গমন করেন। ফিরে আসেন ১১১৪ সালে। বত্রিশ বছর বয়েসে শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত হন।

৬: ১১২১ সালে সাবতার কাযি (প্রধান বিচারক) নিযুক্ত হন। একটানা ১৬ বছর এই দায়িত্ব পালন করেন এখানে। ১১৩৬ সালে বদলি হয়ে গ্রানাডার বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১১৪৪ সালে ফের সাবতার প্রধান বিচারপতি হন।

৭: তখন মুরাবিতীনের শাসনামল চলছিল। সাবতা দ্বীপ মুরাবিতীনের অধীনে ছিল। মাগরিব (মরক্কো-তিউনিসিয়া-আলজেরিয়া ইত্যাদি) অঞ্চলে ইসলামের ইতিহাসে যত সালতানাতে উদ্ভব ঘটেছিল, মুরাবিতীন সালতানাত ছিল সবচেয়ে বড় ও মহান। ইসমাইলি শী'আদের ভ্রান্ত আকীদা ও নানামুখি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশুদ্ধ সুন্নী আকীদায় দীক্ষিত করার জন্যে, এই দাওলার জন্ম হয়েছিল।

৮: প্রাথমিক অবস্থায় এই দাওলার সূচনা হয়েছিল, সংস্কার আন্দোলন হিসেবে। পরে আস্তে আস্তে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিগ্রহ করেছে। প্রতিষ্ঠাতাদের সবাই ছিলেন হক্কানী রক্কানী আলেম। ইমাম মালেক রহ.-এর একনিষ্ঠ অনুসারী। সেনেগাল নদীর দক্ষিণ তীর থেকে শুরু করে, তারা একে একে দখল করে নিলেন পুরো মাগরিব। তারপরে আন্দালুস। বাইয়াত দিলেন আব্বাসী খিলাফাহকে। এই একটা ব্যাপার, যেখানেই কোনও সুন্নী দাওলা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আব্বাসী খিলাফার কাছে বায়আত দিয়েছে।

৯: দাওলা মুরাবিতীন আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েছিল নাইজার থেকে ক্যামেরুন ও নাইজেরিয়া পর্যন্ত। দাওলার প্রতিটি সদস্য ছিলেন অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী। বেদুইনদের মতো সাদামাটা জীবন ছিল তাদের। কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন ছিল। প্রাচুর্য বা বিত্তের প্রতি সম্পূর্ণ নির্মোহ ছিলেন তারা। দাওলার প্রতিটি খাত ছিল অপচয়মুক্ত। উর্ধতন থেকে শুরু করে নিম্নতম পর্যন্ত সবাই প্রথম যুগের মতো রাতজাগা রুহবান আর দিনমানা ফুরসান ছিলেন।

১০: মুরাবিতীন সালতানাতে আলিম ওলামার যথাযথ কদর হত। শেষের দিকে এসব গুণ হারিয়ে বসার কারণেই মুরাবিত সালতানাতে পতন ঘটে। এই মুজাহিদ সালতানাতেই কাযি আয়ায বেড়ে

ওঠেন। শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেন। উম্মাহর ইতিহাসে যে কয়জন বিশ^কোষধর্মী জ্ঞানের অধিকারী হিশেবে পরিচিত, কাযি ইয়ায তার অন্যতম। দ্বীনি ইলমের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই তিনি গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। আজীবন শিক্ষাদান কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। কুরআন হাদীস ফিকহসহ নানা শাখায়, অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। তবে হাদীস শাস্ত্রেই তার বেশি দখল ছিল।

১১: তিনি যখন পরিণত বয়েসে উপনীত হলেন, তখন দাওলার পতনের আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বাল্যে ও যৌবনে যে দাওলাকে উন্নতির চরম শিখরে দেখেছেন, পরিণত বয়েসে সে দাওলাকে আশ্বে আশ্বে পতনের দিকে ধাবিত হতেও দেখেছেন।

১২: পরিণত বয়েসে তিনি ছিলেন তার যুগে, নিজ দেশের সেরা আলিম। সেরা ফকীহ, সেটা মুহাদ্দিস। মালেকী মাযহাব ছাড়া, আব্বাসী খিলাফাহর পুরো অঞ্চল জুড়েও তার মতো সর্ববিদ্যায় পারদর্শী আলিমের জুড়ি মেলা ভার ছিল। মুরাবিতীন সালতানাত ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়ে পড়ল। রাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল হয়ে এল। দাওলার বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ল। আগের মতো জিহাদ ও মুজাহাদা না থাকাতে, সামরিক ও প্রতিরোধ বিভাগ দুর্বল হয়ে পড়ল। এই সুযোগে আরেকটি সালতানাত মাখাচাড়া দিয়ে উঠল। দাওলাতুল মুয়াহহিদ্দীন।

১৩: মুয়াহহিদ্দীন সালতানাত ছিল মুরাবিতীনের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর প্রতিষ্ঠাতা ইবনে তাওয়ামরুত নিজেকে মাহদী হিশেবে ঘোষণা দিয়েছিল। তার আকীদা গড়ে উঠেছিল মুতাযেলা ও জাহমিয়াদের আকীদার সংমিশ্রণে। ইবনে তাওয়ামরুত ও তার অনুসারীরা, ক্ষমতা সুসংহত করতে গিয়ে, তাদের পূর্বসূরী মুরাবিতীনের উপর অত্যন্ত নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছিল। শুধু সেনা বা সরকারী কর্মকর্তাদের উপরই নয়, মুরাবিতীন শাসনে থাকা শহরের নাগরিকদের উপরও নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। বিরোধীপক্ষের শহরগুলোকে গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। নারীদেরকে বন্দী করে বাঁদী বানিয়েছে। এহেন বর্বর-পাশবিক আচরণ আর রক্তবন্যার উপর দিয়ে মুয়াহহিদ্দীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৪: কাযি ইয়ায এমন কল্পনাতে নির্দয়তা দেখে, সাবতাবাসীর ব্যাপারেও এমন কিছু আশংকা করলেন। তখনো মুয়াহহিদ্দীনের কালো হাত সাবতা পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি। তিনি শহরের প্রধান কাযি। সাবতার সকলে তাকে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে। ভালোবাসে। তার প্রতি আস্থা রাখে। তিনি এখানেরই সন্তান। সবাই তার কাছে বাড়তি কিছু আশাও করে। দুর্দিনে তাদের নেতৃত্বের স্থান দখল করে, তাদেরকে মুক্তির বন্দরে পৌঁছে দেবেন, এমন তামান্নাও রাখে সাবতাবাসী। একজন আলিমের কাছে আওয়ামের এমন চাহিদার মাঝে কোনও ভুল নেই। অতিরঞ্জন নেই। বাড়াবাড়ি নেই। সত্যিকার আলিম তো জনমুখিই হবেন। তাদের সুখদুঃখে পাশে দাঁড়াবেন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন।

১৫: ‘সালা’ নামের একটি শহর, মুয়াহহিদ্দীন যোদ্ধাদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা ঠেকাতে, প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। পাল্টা প্রতিশোধ হিশেবে, মুয়াহহিদ্দীন যোদ্ধারা পুরো শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিল। কথিত আছে, তারা তাদের দাওলা কায়ম করতে প্রায় একমিলিয়ন



মানুষ হত্যা করেছিল। সে যুগে দশ লক্ষ মানুষ যা তা ব্যাপার নয়। প্রতিপক্ষের পুরো অঞ্চলকে তারা প্রায় খালি করে ফেলেছিল।

১৬: সবদিক বিবেচনা করে, কাযি ইয়ায সাবতাবাসীর সাথে পরামর্শ করলেন। সবাই বহু চিন্তাভাবনার পর রায় দিল, বিনা প্রতিরোধে মুয়াহহিদ্দীনের আনুগত্য মেনে নিবে। শহরের প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল। আর মুয়াহহিদ্দীনের গণজোয়ারের তোড়ে, ভঙ্গুর মুরাবিতীন সৈন্যরা টিকে থাকতে পারবে না। তার চেয়ে আপাতত হত্যাযজ্ঞ এড়াতে, আপোষ করে নেয়াই শ্রেয়।

১৭: কাযি ইয়াযকে পূর্বের পদে বহাল রাখা হল। তিনি সবার কাছেই তখন একবাক্যে বরিত ছিলেন। তার আনুগত্যের সম্মানেই তাকে অপসারণ করা হল না। কাযি সাহেব আগের মতোই শহর পরিচালনা করে যেতে লাগলেন। মুয়াহহিদ্দীনের অধীনতা মেনে নিলেও, কাযি সাহেব দাজ্জালের আনুগত্য করে মনে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ইবনে তাওয়ামরুতের বর্বরতা দেখে তাকে দাজ্জাল ছাড়া আর কিছু ভাবা যাচ্ছিল না।

১৮: মুরাবিতীনের রাজধানী ছিল মারাকেশ। শহরটা দখল করার পর, মুয়াহহিদ্দীন সেনারা শহরের প্রতিটি মানুষকে হত্যা করল। নারীদেরকে বেছে বেছে দাসী বানানো হল। কোনও ঘরকে আস্ত রাখল না। মসজিদ-মাদরাসা-খানকা কিছুই বাদ পড়ল না। মুয়াহহিদ্দীনের যুক্তি হল, মুরাবিতীনরা মুশরিক। তারা মুজাসসিমা আকীদা পোষণ করে। আল্লাহর জন্যে মানুষের মতো শরীর সাব্যস্ত করে। তার শিরকে লিপ্ত ছিল এতদিন। তাই গোটা শহর নাপাক হয়ে আছে। পাক করতে হবে। সালা, মারাকেশ ও ওয়াহরান শহর দখলের পর, মুয়াহহিদ্দীনের হত্যাযজ্ঞ দেখে, কাযি ইয়ায সংশয়ে পড়ে গেলেন। আত্মসমর্পন করা সত্ত্বেও সাবতার উপরও এমন কেয়ামত নেমে আসে কি না! এখন হয়তো কিছু বলছে না। পরে সবদিক গুছিয়ে যদি এদিকে আসে? সাবতাওতো মুরাবিতীনের মতো হুবহু একই মানহাজ মেনে চলে? এই শহরের নাপাকিও যদি মুয়াহহিদ্দীনরা পবিত্র করার খাহেশ মনে মনে পোষণ করে?

১৯: কাযি ইয়ায গোপনে ইয়াহয়া বিন গানিয়ার সাথে যোগাযোগ করলেন। ইয়াহয়া ছিলেন মুরাবিতীনের নিয়োগকৃত, ক্ষমতায় থাকা সর্বশেষ গভর্নর। তিনি ছিলেন মুরাবিতীন সমর্থকদের সর্বশেষ আশা-ভরসার স্থল। তার শাসনাধীনে ছিল আন্দালুসের পূর্বদিককার ‘মায়ুরকা’ দ্বীপপুঞ্জ। তিনি মায়াহহিদ্দীনের হাত থেকে মাগরিব অঞ্চল পুনঃদখলের প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। কাযি আয়াযের যোগাযোগকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। কাযি সাহেবের মতো আলিমের সমর্থন পেয়ে, তার মনোবল আরও তুঙ্গে উঠল। নিজে হকের উপর আছেন, এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল।

২০: ইয়াহয়া বিন গানিমের সমর্থন পাওয়ার পর, সাবতাবাসী ঘোষণা দিয়ে, মুয়াহহিদ্দীনের বাইআত ভেঙে ফেলল। ঘটনার বিবরণ শুনে মুয়াহহিদ্দীন নেতারা রীতিমতো ক্ষেপে গেল। তারা সাবতা দখলের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। সাবতাবাসী অবস্থা বেগতিক দেখে, ইয়াহয়া গানেমের সাথে যোগাযোগ করল। কিন্তু ইয়াহয়ার পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেল না। নিজেও এল না, অন্য কাউকে দিয়ে সেনাসাহায্যও প্রেরণ করল না।

২১: মুয়াহহিদ্দীনরা প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর, সাবতার দিকে পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসতে শুরু



করল। কাযি ইয়ায দেখলেন সাবতাবাসীর উপর গণহত্যার খড়্গ নেমে আসছে। উপায়ান্তর না দেখে, একা একা শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। নিজেকে মুয়াহহিদ্দীনের হাতে সোপর্দ করলেন। কাযি সাহেবকে গ্রেফতার করে প্রধান নেতা আবদুল মুমিন বিন আলি কাছে নিয়ে যাওয়া হল। কাযি সাহেব বললেন,

-সাবতাবাসীর কোনও দোষ নেই। বায়আত ভঙ্গ করার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার। আমার প্ররোচনাতেই তারা এ-কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তাদের কোনও দোষ নেই। আমিই দোষী।

সবকিছু শোনার পর, আবদুল মুমিন ক্ষমার ঘোষণা দিল। তবে একটা শর্ত দিল,

-আপনি আপনাকে ক্ষমা করব একটা শর্তে! আপনাকে কষ্ট করে, কয়েকটা কাজ করতে হবে, ক: ইবনে তাওয়ামরুতকে নিষ্পাপ ঘোষণা করে ফতোয়া দিতে হবে।

খ: তাকে মাহদী বলে স্বীকার করতে হবে।

গ: এ ব্যাপারে একটা কিতাব লিখে দিতে হবে। যাতে সবার মাঝে বিতরণ করা যায়।

২২: কাযি সাহেব বুঝতে পারলেন, তাকে ব্যবহার করে, মুয়াহহিদ্দীনরা সবার কাছে সমাদৃত হতে চাচ্ছে। তার কিতাব ব্যবহার করে, এতদিনের কালিমা মোচন করার প্রয়াস পাবে। শুধু তাই নয়, একজন ভ-কে মাহদী বানানোটা প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হবে। মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে, নিজের জীবন বাঁচাবেন নাকি, সত্য বলে লাখো মানুষকে গোমরাহীর পথ থেকে সরিয়ে নিজের জীবনকে জেনেশুনে হুমকির দিকে ঠেলে দেবেন?

২৩: সত্যিকারের আলিমগন এমন পরিস্থিতিতেও হক বেছে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। কাযি সাহেবও কালবিলম্ব না করে মুখের উপরই বলে দিলেন,

-ইবনে তাওয়ামরুত একজন ভণ্ড। সে কিভাবে নিষ্পাপ হবে? মাহদী হওয়া দূরের কথা সে তো দাজ্জালের মতো আচরণ করেছে। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের রক্তে তার হাত রঞ্জিত হয়ে আছে।

২৪: মুয়াহহিদ্দীনরা কাযি সাহেবের বক্তব্য শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। বর্ষার আঘাতে আঘাতে তার শরীর ঝাঁজরা করে ফেলল। এতেই তাদের অন্ধ আর বিকৃত আক্রোশ চরিতার্থ হল না, তারা কাযি সাহেবকে টুকরো টুকরো করে কাটল। তারপর ছিন্নভিন্ন টুকরাগুলো একত্র করে মারাকেশের এক অজ্ঞাত স্থান দাফন করে ফেলা হল। গোসল দেয়া হল না। জানাযা পড়া হল না। শুধু তাই নয়, সে অঞ্চলটি খ্রিস্টানদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হল। খ্রিস্টানরা কবরের পাশে গীর্জা আর অনেক মঠ তৈরী করেছিল।

২৫: হক হোক বাতিল হোক, কোনও দলকেই আল্লাহ তা'আলা চিরদিন ক্ষমতার শীর্ষে থাকতে দেন না। একসময় মুয়াহহিদ্দীনদেরও পতন হল। বিজয়ীবেশে এল মেরিনীরা। মেরিনী সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ৭১২ হিজরীতে কাযি ইয়াযের কবরকে খ্রিস্টানদের থেকে উদ্ধার করা হল।

----

কাযি আয়াযের মৃত্যু সম্পর্কে ভিন্নমতও প্রচলিত আছে। তার তাকীদা নিয়েও টানা হ্যাঁচড়া আছে। আশআরীরা বলে তিনি আশ'আরী ছিলেন। হাম্বলীরা বলে তিনি হাম্বলী ছিলেন। তবে আশ'আরী

হওয়াটাই বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ সেকালে মালেকীগণ এবং এ যুগে, সাধারণত আশআরী হয়ে থাকেন)।

--

কিছু ভাবনা:

১: প্রকৃত আলিম যারা, তারা কখনো বাতিলের সামনে মাথা নত করেন না। দ্বীনের কোনও বিধানের ক্ষেত্রে তাগুতের সামনে আপোষ করেন না। হক্কানী ওলামায়ে কেরামগণ সাধারণত আযীমতের উপর আমল করেন। রুখসত গ্রহণ করেন না। বিশেষ করে ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রে।

২: রক্কানী ওলামায়ে কেরাম, হকের পতাকা বুলন্দ রাখতে, আমৃত্যু হকেরও উপর অবিচল থাকতে পিছপা হন না। জেল-জুলুমকে ভয় পান না। যালিম তাগুত শাসকের সামান্য ‘মুলো’ দেখে ঝুলে পড়েন না। ফাঁসির কাষ্ঠ বেছে নেয়াকে প্রাধান্য দেন,

مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا يَدُلُّوهُ تَبْدِيلًا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلًا صَدَقُوا مَا

এই ঈমানদারদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের নজরানা আদায় করেছে এবং আছে এমন কিছু লোক, যারা এখনও প্রতীক্ষায় আছে, আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি (আহযাব ২৩)।

৩: যখন দেখেন তার নমনীয় আচরণে, হকপন্থী মানুষ বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তিনি পাহাড়ের মতো অনড় অবস্থানে চলে যান। সরকারী বরাদ্দ, বিপুল উপহার-উপঢৌকন তাকে বিচ্যুত করতে পারে না।

৪: আর একজন আলিম যখন, অনেক মানুষের আস্থার প্রতীকে পরিণত হন, এমতাবস্থায় সেই আলিমের জন্যে উচিত নয়, রুখসত তথা শরীয়তের ছাড় গ্রহণ করা। হিম্মত থাকলে আযীমত গ্রহণ করে নির্যাতনের পথ বেছে নেয়া উচিত। তাহলে মানুষও হিম্মত পাবে। হকের সত্যিকার রূপ বুঝতে পারবে। তবে যদি মনে হয়, আযীমতের পথে গেলে, নির্যাতনের ভার সহ্য করা যাবে না, তখন ছাড় করা যেতে পারে। তবে ফিতনার আশংকা থাকলে, নিজেকে নেতৃত্বের আসন থেকেও সরিয়ে নেয়া কাম্য।

৫: নবীজি সা. সবসময় দু’টি পথের সহজতর পথ গ্রহণ করতেন। এমনটা অনেকে বলে, যুক্তি দিতে চান। তাদের জানা থাকা দরকার, ঈমান কুফরের প্রশ্নে নবীজি সা. কখনোই কঠিন পথ বেছে নিতে তিলেক দ্বিধা করেননি।

৬: ফাঁসির রায় হওয়ার পর, সাইয়েদ কুতুব রহ.-কে বলা হয়েছিল, সরকারের সাথে আপোষ করে নিতে। তিনি এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন,

-উম্মত যাদেরকে আদর্শ মনে করে, তাদের উচিত নয়, যালিমের কাছে মাথানত করা। তাদের সাথে আপোষ করে নেয়া।

৭: ইসলামের শুরুর দিকে দেখা গেছে, যালিম শাসকের বিরুদ্ধে, একদল আলিম সবসময় সোচ্চার থাকতেন। জেল-যুলুমেও পিছপা হতেন না। ভয়ে দমে যেতেন না।

৮: এখন কেন যেন উল্টো, যিনি যত বেশি ইলমের অধিকারী, তিনি তত বেশি চুপ থাকেন।

ততবেশি হিকমত অবলম্বন করেন।

৯: বর্তমানের বড় আলিমগন, তাওত-কুফর-যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে হয়রানির শিকার হওয়ার চেয়ে, চুপ থেকে মাদরাসা টিকিয়ে রাখার মেহনতে शामिल থাকাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

১০: যাদেরকে আদর্শ বলে মানি, যাদের থেকে ইলম শিখি, যাদেরকে ইলমে বড় বলে মনে করি, এমন কয়েকজন যদি হিম্মত করে সামনে বাড়তে পারতেন, তাহলে আমাদের মতো অসংখ্য ‘কাপুরুষ’ ‘বীরপুরুষে’ রূপান্তরিত হওয়া সহজ হয়ে যেত।

alammin5g

# সাবতার ইদরীসী!

আতিক উল্লাহ

দিনলিপি-৪৯৯

(১৬-০৩-২০১৬)

--

সাবতা। একটি বর্ণিল শহরের নাম। দেশ বললেও কি ভুল হবে? জিব্রাল্টার প্রণালীর কোল ঘেঁষে দুটি আছে। সাবতা ও মালীলিয়াহ। দু'টোই শহরই ছিল মাগরিব (মরক্কো)-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গ্রানাডার পতনের পর থেকেই স্পেনীশরা এ শহর দু'টিকে জবর দখল করে রেখেছে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সাবতা ছিল কার্থেজিয়ানদের দখলে। খ্রিস্টপূর্ব চল্লিশ সালের দিকে রোমান সম্রাট কালিগুলা সাবতাকে তার সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসে। ৪২৯ খ্রিস্টাব্দে এই ছোট্ট শহরকে দখল করে নেয় ভ্যান্ডালরা। বলাবাহুল্য আরবরা স্পেনকে আন্দালুস বলে। আর আন্দালুস শব্দটা এসেছে 'ভ্যান্ডাল' শব্দ থেকে। ৯৩১ সালে সাবতা আন্দালুসের উমাইয়া খলীফা আবদুর রহমান আন-নাসিরের অধীনে আসে। অবশ্য তার আগে শহরটা আরো দুইবার হাত বদল হয়: একবার গথিকরা দখল করে, তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয় রোমানরা।

১০৬১ সালে সিউতা দখল করে বারবাররা। ১০৮৪ সালে এখানে আসেন মহান মুজাহিদ ইউসুফ বিন তাশাফীন রহ.। ১১৪৭ সালে এই শহর ক্রায়ত্ত্ব করে মরক্কোর মুয়াহহিদরা। ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতন হয়। তারপর আবার সাবতা হাতবদল হয়। ১৪৯৭ সালে সাবতা দখল করে নেয় পুর্তগীজরা। ১৫৮০ সালে পুর্তগাল অধীনস্থ হয় স্পেনের। সাথে সাথে সাবতাও স্পেনের অধীনে আসে।

১৭৭৪ সালে মরক্কোর খলীফা মাওলা মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ সাবতা দখল করার অভিযান পরিচালনা করে। তবে সফল হতে পারেনি। একের পর এক অব্যাহত চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমানরা সফল হতে পারেনি। এমনকি অবিস্মরণীয় মুজাহিদ আবদুল করীম খাতুবি রহ.ও চেষ্টা করেছিলেন। প্রায় বিজয়ের কাছাকাছিও চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি।

মরক্কো কখনই সাবতার দাবি ছাড়েনি। জাতিসংঘে পর্যন্ত দাবি তুলেছে। বাদশাহ হাসান ২য় পীড়াপীড়ি দেখে, স্পেন কৌশল করে সাবতা ও মালীলিয়াহকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেয়। ১৯৯৫ সালে। পুরো নিয়ন্ত্রণ অবশ্য স্পেনের হাতেই থাকে।

এতো পুরান দিনের কথা। ড. ইউনুস নোবেল পুরস্কার পেলেন। তারপর থেকে বিভিন্ন দেশ থেকেও একের পর এক পুরস্কার পেতে থাকলেন। এরমধ্যে একটা সম্মাননা পেলেন সাবতা থেকে। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় সিউতা। অন্যদের কাছে পুরস্কারটা হয়তো অন্য আর দশটা পুরস্কারের মতোই ছিল। আবার কারো কারো কাছে বিষয়ও জাগিয়েছিল। কারণ ছোট্ট একটা শহর হয়েও ভিনদেশী এক কুসিদজীবিকে পুরস্কৃত করেছে।

সিউতা একটা ছোট্ট শহর। বড়জোড় ২৯ কিলোমিটার আয়তন। কিন্তু ছোট্ট হলে কী হবে, তার অনেক বৈশিষ্ট্য। এই একটা শহরেইগাদগাদি করে বাস করে: খ্রিস্টান। মুসলমান। ইহুদি। হিন্দু। বৌদ্ধ। আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চূড়ান্ত' নমুনা এ-শহরে পাওয়া যায়।

এতটাই সম্প্রীতি, এক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে আরেক ধর্মের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। গান গায়। অনেক পরিবার এমন আছে, মা খ্রিস্টান কিন্তু বাবা ও সন্তানেরা মুসলমান। উল্টোটাও আছে। একটা ডকুমেন্টারিতে দেখলাম খ্রিস্টান মা তার মুসলমান কন্যার হিফয শুনছে। মেয়েকে মাদরাসায় পৌঁছে দিচ্ছে। তারা বিশ্বকে কী বার্তা দিতে চাচ্ছে, আল্লাহই জানে।

আরও অবাক করা ব্যাপার হলো সাবতার প্রধান মসজিদের নাম হলো কাদেরিয়া মসজিদ। আর্কিটেক্টের নাম: হিশাম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম। এই একই ব্যক্তি আবার সেখানকার একমাত্র হিন্দু মন্দিরেরও আর্কিটেক্ট। প্রশ্ন জাগে:

= সাবতাবাসীদের মধ্যে এই বিরল মানসিকতা কোথেকে এল?

-শরীফ ইদরীসি থেকে!

-তিনি কে?

-তিনি সাবতার প্রাণ!

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইদরীসি। তিনি কুরাইশ বংশের মানুষ। সাইয়েদও বটে। বংশধারা আলী রা.-এর সাথে গিয়ে মিশেছে। রাজবংশেরও বটে। গ্রানাডা শাসন করতো 'হাম্মুদ' বংশ। তিনি ছিলেন এই পরিবারের সন্তান।

তার জন্ম হয় এই শহরে। ১১০০ সালে। মৃত্যু ১১৬৬ সালে। অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন তিনি। বহু শাস্ত্রে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য। তবে তিনি বেশি বিখ্যাত হয়েছে ‘ভূগোলবিদ’ হিসেবে।

এখনকার সিসিলি দ্বীপের শাসক ছিলেন কিং রজার (২য়)। ১০৯৫-১১৫৪। পরম বিদ্যোৎসাহী। জ্ঞানানুরাগী। প্রজাবৎসল। পুরো স্পেনে মুসলিম হত্যাযজ্ঞ চললেও, তিনি একশ ভাগ না হলেও, নিজের স্বার্থে মুসলমানদের প্রতি কিছুটা নমনীয়তা দেখিয়েছিলেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতেই সাবতাও মালীলিয়ার মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করা হয়নি।

কিং রজারের অনেক দিনের ইচ্ছে, পুরো পৃথিবীর একটা মানচিত্র আঁকানোর। সেটাতে তার সিসিলি রাজ্যও পরিষ্কারভাবে দেখানো হবে। খোঁজ-খবর করে জানতে পারলেন আল-ইদরীসির কথা। দরবারে ডেকে নিয়ে দায়িত্ব দিলেন। ইদরীসি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করলেন।

সেটাই ছিল বিশ্ব-ইতিহাসে সর্বপ্রথম অনেকটা পরিপূর্ণ মানচিত্র। ৭০টা চিত্র সম্বলিত একটা বৃহদায়তন বই রাজাকে উপহার দেন ইদরীসি। ১৬১৯ সালে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় বইটা। রোম থেকে।

এই মানচিত্রের উপর নির্ভর করেই পরবর্তীতে ইউরোপের বিশ্ব অভিযান পরিচালিত হয়। পুর্তগীজরা বিশ্বজয়ে বের হয়। উসমানী খিলাফার বড় বড় জয়ে, আরেক মহান সমুদ্রবিদ পীরি র‍‌ন্সও এই মানচিত্রের সাহায্য নিয়ে আরও পরিপূর্ণ মানচিত্র আঁকতে সক্ষম হন।

এখনকার মানচিত্রগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হলো: তাকালে দেখা যাবে, ইউরোপকে সারা বিশ্বের কেন্দ্রস্থল হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু ইদরীসির মানচিত্রে ‘কা’বা’ ছিল বিশ্বের কেন্দ্রে।

ইদরীসির ঘটনা দেখে কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার হয়:

এক: ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের মুখাপেক্ষী ছিল। পরে আস্তে আস্তে অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টে গিয়েছে।

দুই: ইউরোপ মুসলিম সভ্যতার জাগতিক দিকের পুরো নির্ধারিত আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিল।

তিন: ইউরোপ এখনো মুসলিম হামলা আশংকা করে এজন্য আজো জিব্রাল্টার প্রণালী, সাবতা-মালীলিয়া দ্বীপগুলো দখল করে রেখেছে।



চার: সাবতার এই সাম্প্রাদায়িক সম্প্রীতি বাহ্যিকভাবে দেখতে যতই চকচকে মনে হোক, ভেতরের অবস্থা অতটা সুখকর নয়। পুরো ইউরোপের মধ্যে সাবতায় বেকারত্বের হার বেশি।

পাঁচ: ইউরোপে যেতে হলে মরক্কো দিয়েই যেতে হবে। সোনালী অতীতে উকবা বিন নাফে যেভাবে এগিয়েছিলেন। যায়েদ-মুসা রহ. যেভাবে গিয়েছিলেন। মরক্কোতে অবশ্য মেহনত শুরু হয়েছে। অবশ্য আমার মনে হয়, মরক্কো থেকে ইউরোপে যেতে হলে, বর্তমানের মেহনতকারীরা ইউসুফ বিন তাশাফীনের পরিকল্পনা ধরে অগ্রসর হলে, ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

ছয়: সাবতার মুসলিম যুবকদের অভিযোগ, তাদেরকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে পদায়ন করা হয় না। স্পশকাতর অফিস আদালতে চাকরি জোটে না। ভিন্নমতও আছে। এই যুবকরা বেশ কাজে আসতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়: শরীফ আলইদরীসি রহ. নিজের জন্মভূমিকে, নিজের স্বকীয়তাকে যেভাবে স্বতন্ত্র রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, এখনকার মুসলিমরা ততোটা পারছে না। তাদের মধ্যে একটা আফিম ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে:

-উদারতার আফিম। সুন্দর সহাবস্থান।

শব্দগুলো শুনতে মজাদার। চটকদার। কিন্তু একজন মুসলমান কখনোই এই আফিমে মজতে পারে না। আমরাও সুন্দর সহাবস্থান চাই। তাই বলে এক পরিবারে কেউ খ্রিস্টান, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ:এটা মেনে নেয়া যায়? সাবতার অধিবাসীদের মধ্যে একটা স্লোগান জোরালোভাবে চালু করে দেয়া হয়েছে:

= ধর্ম যার যার, দেশ সবার।

কথা সত্য, মতলব খারাপ।

কালিমাতু হাক্কিন উরীদা বিহাল বাতিল (আলি রা.)।

# আন্দালুস

## আতিক উল্লাহ

আন্দালুস হাতছাড়া হয়েছে ১৪৯২ সালে। অনেক মুসলিম ইতিহাসবিদই মনে করে, ইসলামের ইতিহাসে, আন্দালুস হারানো ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

কিন্তু এর চেয়েও বড় ট্রাজেডি ইসলামের ইতিহাসে বিদ্যমান। কাদেসিয়ার ময়দানে সাহাবায়ে কেরাম, পারস্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। তারপর থেকে পারস্য ধীরে ধীরে মুসলমানদের অধীনে আসতে থাকে। উমাইয়া খেলাফতকালে পুরো পারস্যই খিলাফাহর অধীনে চলে আসে। আব্বাসী খিলাফতকালেও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, আগের অবস্থা বিরাজমান থাকে। তারপর আসে, বর্বর মোঙ্গলরা। তাদের অধীনে (১২৫৬-১৫০৮) ইরানের আহলে সুন্নাত শুরুতে নির্যাতনের শিকার হলেও, পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

মোঙ্গলদের শাসন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসে। এই সুযোগে রক্তপিপাসু শী'আ ইসমাইল সাফাভী শক্তি সঞ্চয় করে ইরান দখল করে। ১৫০১ সালে। ইসমাইল সাফাভী আহলে সুন্নাতের উপর গণহত্যা চালিয়ে ইরানকে শী'আগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত করে।

ইসমাইল সাফাভীর আগে, ইরান ছিল শতভাগ সুন্নী মুসলমানের দেশ। ইসমাইল সাফাভী শুরু করে দিয়ে গেছে। আজ খোমেনী-বাহশার-হাসান নাসরুল্লাহরা সে কাজকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আন্দালুস হাতছাড়া হওয়ার পর, মুসলমানরা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, গণহত্যার শিকার হয়েছে। কিন্তু তার জের বা রেশ এখন আর নেই। ইরানের ক্ষেত্রে বিষয়টা সম্পূর্ণ উল্টো। তারা শুরু থেকেই আহলে সুন্নাতের উপর গণহত্যা চালিয়ে আসছে। আজো ইরাকে, শামে তারা তাদের আক্রোশ চরিতার্থ করেই চলেছে।

আন্দালুস তাবয়ীগনের বিজিত অঞ্চল।

পারস্য 'সাহাবায়ে কেরামের' বিজিত অঞ্চল।

দু'টির মূল্য এক হতে পারে না।

আজ সময় এসেছে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর।

আন্দালুসের পাশাপাশি আমাদেরকে ‘পারস্য’ উদ্ধারের ফিকিরও করতে হবে। মানচিত্রকে সাহাবা যুগে নিয়ে যেতে হবে।

## এক চুমুকে ইতিহাস: ৬৮

### আতিক উল্লাহ

---

আন্দালুসের পুরোটাই জয় হয়েছিল মাত্র দুইটা সেনাদলের মাধ্যমে।

প্রথম দল: তারেক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে। সেনাসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। এ-স্বল্পসংখ্যক সেনা নিয়েই তারা মধ্য আন্দালুস পর্যন্ত জয় করে ফেলেছিলেন। কর্ডোভা-ইশবীলিয়া-তৎকালীন রাজধানীঃ টলেডোও এর মধ্যে ছিল।

দ্বিতীয় দল: মূসা বিন নুসাইর ও তার পুত্র আব্দুল আযীযের নেতৃত্বে বাকি অংশ বিজিত হয়েছিল।

প্রতিপক্ষ গথির রাজার সেনাসংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। মূসা বিন নুসাইর পুরো ইউরোপ জয় করার ছক কষে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো এলো, খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের ফরমান:

-বিজয়াভিযান বন্ধ করো। দিমাশকে ফিরে এসো শিখ্রী।

মুসলিম ইতিহাসের এক ট্রাজেডী। মূসা বিন নুসাইর আর মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে রাজ্যজয়ের সর্বোচ্চ গতিতে থাকাবস্থায় ডেকে পাঠানোটা।

## এক চুমুকে ইতিহাস: ২০৫

### আতিক উল্লাহ

ওলীদ বিন আবদুল মালিক রহ. (৭০৫-৭১৫)। উমাইয়া খিলাফাহর ষষ্ঠ খলীফা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সমরকুশলী ছিলেন। একসাথে চারটা সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন:

প্রথম বাহিনী: ভারতজয়ের লক্ষ্যে।

দ্বিতীয় বাহিনী: মধ্যএশিয়া জয়ের লক্ষ্যে।

তৃতীয় বাহিনী: আন্দালুস জয়ের লক্ষ্যে।

চতুর্থ বাহিনী: কনস্টান্টিনোপল জয়ের লক্ষ্যে।

প্রায় পুরো বিশ্বের বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এবং আল্লাহর খাস নুসরতে সফলও হয়েছিলেন। এটাই খিলাফতের বরকত। সারা বিশ্ব এক হলেও কিছুই করতে পারবে না।  
ইনশাআল্লাহ।

alaminn5g

# একটি ঝাড়বাতির গল্প শোনো.....

আইনুল হক কাসিমী

গ্রানাডার একজন সম্রাট। তার শাহজাদাকে বিয়ে করাবেন। রাজকীয় আড়ম্বরে, বিয়ের শানাই বাজিয়ে, কোনো ললনাকে পুত্রবধূ বানিয়ে প্রাসাদে তুলবেন। এজন্য হন্যে হয়ে পাত্রী খুঁজে চলছেন। তবে যেনতেন পাত্রী হলে চলবে না; রাজপরিবারের উপযুক্ত হতে হবে। এর জন্য পাত্রীকে অবশ্যই কুরআনে কারিমের হাফেজা হতে হবে। পাশাপাশি হাদিসের জ্ঞান থাকা লাগবে। এরকম কোনো মেয়ে পাওয়া গেলে, সে-ই হবে রাজপরিবারের বউ হবার উপযুক্ত। কিন্তু মুশকিল দেখা দিলো যে, এরকম গুণবতী মেয়ে পাওয়া যাবে কীভাবে! আর কে-ই বা হাদিস দেবে এরকম কোনো মেয়ের!

শেষমেশ এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন সম্রাট। ঘোষক পাঠিয়ে শাহি এলান করিয়ে দিলেন যে, গ্রানাডা শহরের যে বাড়িতে বিয়ের উপযুক্ত এমন পাত্রী রয়েছে, যে পাত্রী একদিকে পুরো কুরআনের হাফেজা, পাশাপাশি হাদিসেরও জ্ঞান রাখে; সেরকম পাত্রীর অভিভাবকরা যেন রাতের বেলা নিজ নিজ বাড়ির বারান্দার সামনে উজ্জ্বল একটা ঝাড়বাতি টানিয়ে রাখে।

কেবল সুলতানকেই নয়; পুরো গ্রানাডাবাসীকে অবাক করে দিয়ে সে রাতে শহরের প্রায় প্রতিটি বাড়ির বারান্দার সামনে ঝাড়বাতি টানানো হয়েছিল! বুঝা গেল, প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এমন যুবতী মেয়ে আছে, যে কুরআনের পাক্কা হাফেজা, এবং হাদিসের জ্ঞান রাখে!

এরপর থেকেই গোটা আন্দালুসে এই রেওয়াজ পড়ে গেল, যে বাড়িতেই একজন মেয়ে কুরআনের হাফেজা হতো, রাতের বেলা সে বাড়ির সামনে একটি ঝাড়বাতি টানিয়ে দেওয়া হতো। সন্ধ্যার আঁধার নামতেই যে বাড়ির সামনে দপ করে জ্বলে উঠত ঝাড়বাতি, বুঝা যেত, সে বাড়িতে একজন কুরআনের হাফেজা মেয়ে রয়েছে!

আহ, কোন সে জান্নাত হারালাম আমরা!  
এই আন্দালুস, আমাদের হারানো ফিরদাউস!  
আবারও কি আসবে ফিরে?

-----

সূত্র: টুইটার

# বালাতুশ শুহাদা বেদনাত আখ্যান!

আইনুল হক কাসিমী

বালাতুশ শুহাদা। ইসলামি ইতিহাসের এক রক্তস্নাত যুদ্ধের নাম। সাধারণ ইতিহাসে এটি টুরসের যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১১৪ হিজরির পবিত্র রমজানুল মুবারক, ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর, রোজ শনিবার এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। খ্রিষ্টান বাহিনী ছিল চারলাখ! মুসলিমদের সেনাপতি ছিলেন আন্দালুসের উমাইয়া গভর্নর, ইসলামি ইতিহাসের অমিততেজা বীর আবদুর রহমান আল গাফিকি। খ্রিষ্টানদের সেনাপতি ছিলেন শার্ল মার্তেল। আরবিতে 'বালাত' অর্থ প্রাসাদ। 'শুহাদা' শব্দটি 'শহিদ' এর বহুবচন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের এত লাশ পড়েছিল যে, এগুলোকে একত্রিত করলে একটি প্রাসাদ হয়ে যেত! কারও কারও মতে, সে প্রান্তরে একটি পাকা রাস্তা ছিল বলে, এ-কে বালাতুশ শুহাদা যুদ্ধ বলা হয়।

চার্লসের পর্বতসম বাহিনীর কিছু ছিল ঘোড়সওয়ার আর কিছু ছিল পদাতিক। এদের শরীরে ছিল নেকড়ের পোশাক। ঘাড় পর্যন্ত লম্বিত চুল। যা জট পাকানো ছিল। এদের ভাবমূর্তি দেখলেই পিলে চমকে যাবার মতো ছিল! চার্লস লয়ার নদী পার হয়ে, নদীকে পেছনে রেখে অবস্থান নিলেন। যুদ্ধের প্রথম আটদিন উভয়পক্ষে হালকা সংঘর্ষ হয়। এতে মুসলমানদের পাল্লা ভারি ছিল। কিন্তু নবম দিনে সংঘটিত হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। দিনভর যুদ্ধ চলে। অবশেষে রাতের আঁধার নেমে এল। এবারও মুসলমানদের পাল্লা ভারি ছিল। দু'পক্ষ পৃথক হয়ে গেল। আরও একটু সময় যুদ্ধ স্থায়ী হলে মুসলমানরাই জেতার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

পরদিন শনিবার। যুদ্ধের দশম দিন। আবারও যুদ্ধ শুরু হলো। বিজয় মুসলমানদের পদচুম্বন করতে যাবে, ঠিক তখনই শোরগোল উঠল যে, গনিমতের মালসহ মুসলমানদের সেনাছাউনি বিপদের সম্মুখীন! দুশমনেরা সেখানে হামলা করেছে! এতে দুর্বলচিত্তের বার্বারি মুসলিম সেনারা গনিমতের মাল রক্ষার্থে ময়দান ছেড়ে ছাউনি অভিমুখে ছুটল। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেল। আবদুর রহমান আল-গাফিকি সেনাদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সব প্রচেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এতক্ষণে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা একেবারে শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। বীরের মতো লড়াই করে যেতে লাগলেন গাফিকি। তবুও অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজি নন তিনি। হঠাৎ করে শাঁ করে এসে দুশমনের একটা তীর তাঁর গায়ে বিদ্ধ হয়। ঘোড়ার পিঠ থেকে তিনি ছিটকে পড়েন। সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন।



দুটি বিপদের সম্মুখীন হয় মুসলিম বাহিনী। এক. নিজেদের বিশৃঙ্খলা। দুই. সেনাপতির শাহাদাত। ব্যস, তাদের মনোবল ভেঙে যায়। এই সুযোগে খ্রিষ্টান বাহিনী হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। মুসলমানদের লাশের পর লাশ ফেলে সামনে এগোতে থাকে। তবে এত বিপদের মধ্যেও কিছু দৃঢ়চিত্তের মুজাহিদ নিজেদের তরবারির নৈপুণ্য দেখান। চরম বিপদের মুহূর্তেও মুসলমানদের বাহুবল কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারে খ্রিষ্টানরা। একসময় রাতের অন্ধকার নেমে আসে। উভয়পক্ষ ছাউনিতে ফিরে যায়।

মুসলিম বাহিনী ছাউনিতে পৌঁছে একে অন্যের ওপর দোষারোপ করতে লাগল। এমনকি একে অন্যের দিকে হাতিয়ার পর্যন্ত উঠিয়ে নিল! ফরাসিদের ওপর এখন বিজয়ের আশা সম্পূর্ণ দুরাশায় পরিণত হলো। এখন নিরাপদে সরে পড়াই একমাত্র বিকল্প রাস্তা। তাই সে রাতের অন্ধকারেই মুসলিম বাহিনী সেপটিমানিয়ার দিকে পথ ধরল।

সকাল হলে মুসলিম ছাউনিতে সব চূপচাপ দেখে চার্লস ও তার মিত্র ইউডিস মুসলমানদের কোনো নতুন কৌশল মনে করে সন্দিহান হয়ে পড়লেন। তারা সন্তর্পণে জানতে পারলেন যে, মুসলিম বাহিনী সরে গেছে, আর কিছু আহত সাথিদের ফেলে রেখে গেছে সেখানে। কালবিলম্ব না করে তারা মুসলিম বাহিনীর ছাউনিতে পৌঁছে আহত সেনাদের হত্যা করে ছাড়ে। এভাবেই সমাপ্তি ঘটে বালাতুশ শহাদা যুদ্ধের!

ফ্রান্সের কলিজায় সংঘটিত 'বালাতুশ শহাদা' যুদ্ধে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় আন্দালুসের আরব ও বারবারি মুসলিম বাহিনী। কিন্তু সে যুদ্ধে মুসলমানরা জিতলে কী হতো? জানেন না? তাহলে শুনুন-

বালাতুশ শহাদা যুদ্ধে মুসলমানরা জিতলে আজ ইউরোপের ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো। ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক গিবন ও লেনপুলদের মতে, সে যুদ্ধে মুসলমানরা জিতলে প্যারিস ও লন্ডনে, ক্যাথলিক গির্জার পরিবর্তে গড়ে উঠত মসজিদ। অক্সফোর্ড ও অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রে বাইবেলের পরিবর্তে শোনা যেত কুরআনের বাণী!

পুনশ্চ: টুরস ফ্রান্সের বেশ বড়সড় একটি শহর। ফ্রান্সে যাওয়ার পথে এ শহরটা। ফ্রান্সের সীমান্ত থেকে প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার দূরে।

পুনঃপুনশ্চ: পিকচারে দৃশ্যমান হাজার হাজার মুসলিম মুজাহিদের রক্তস্নাত প্রান্তরেই সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক বালাতুশ শহাদা বা টুরসের যুদ্ধ। যা আজও নীরবে মাতম করে যায়!

-----  
সূত্রাবলি:

১- فجر الأندلس - ২২৭, ড. হুসাইন মুআব্বিস

- ২- التاريخ الأندلسي - ১৯৭, ড. আবদুর রহমান আল-হাজি  
৩- بلاط الشهداء - ৪৪, শাওকি আবু খলিল

alammin5g

## দু'টি প্রশ্ন!

আতিক উল্লাহ

দিনলিপি-১৪৮  
(১১-০৩-২০১৫)

\*\*\* দুইটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি আজ বহুদিন ধরে। বহু ক্রোশ ঘুরে। যেখানে যাকেই যোগ্য পেয়েছি, পড়াশুনো করা পেয়েছি-প্রশ্নবাণটা ছুঁড়ে দিয়েছি। সর্বশেষ প্রশ্ন করেছিলাম প্রবাসী এক ভাইকে। তিনি খুবই প্রাজ্ঞ ভাষায়, সহজ করে একটা সমাধান দিয়েছিলেন। তার মতো পড়ুয়া-মুতালি হতে পারলে, কথা ছিল না।

\*\*\* প্রশ্নদুটো ছিল:

(এক) স্পেনের (ও মরক্কোর) মুসলমানরা কেন মালেকি মাযহাব গ্রহণ করেছিল? অন্য মাযহাব কেন গ্রহণ করেনি? এ দুই অঞ্চলে, আগাগোড়া মালেকি মাযহাবেরই প্রাধান্য ছিল। অন্য মাযহাবও ছিল, কিন্তু অতটা সুবিধে করতে পারে নি। আঁটঘাট বেঁধে ঝাঁকিয়ে বসতে পারনি। অন্য মাযহাবগুলো মালেকি মাযহাবের বিজয়দন্ডের সামনে সারাক্ষণই কৃশকায় ক্ষীণকায় লঘুবপু হয়ে জড়োসড়ো হয়ে থেকেছে। এমনকি যখন ইনকুইজিশ চলছিল, তখনও স্পেনের মরিস্কারা মালেকি মাযহাব আঁকড়ে ধরে ছিল।

(দুই) স্পেনে মুসলমানদের পতনের কারণ কী? এই পতনের পেছনে মাযহাবের কোনও প্রভাব ছিল কি?

\*\*\* স্পেনে লিখিত সর্বশেষ ফিকহের কিতাবের নাম 'শরীয়াতুল ইসলাম'। লিখেছেন ঈসা বিন জাবের। কিতাবটা লেখা হয়েছে স্পেনিশ ভাষায়। কাসতালার অধিবাসীদের জন্যে। কারণ ততদিনে তারা আরবী ভাষা ভুলে গিয়েছিল। এই কিতাবটাও মালেকি মাযহাবের ওপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছিল।

\*\*\* অনবরত-নিরন্তর খুঁজে ফিরছিলাম। কোনও লেখা বা ভাষ্যে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায় কিনা। যাক আপাতত সংগ্রহ যা দাঁড়াল, তা হলো; ইবনে খুলদুনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

-স্পেনে মালেকি মাযহাব এতটা আসনপিঁড়ি হয়ে কিভাবে বসতে পারল?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন:

-স্পেনের অধিবাসীদের বেশির ভাগ সফরই হতো হেজাযের দিকে। মক্কা-মদীনাই হতো তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। মদীনা ছিল তখনকার সময়ে 'ইলমের প্রাণকেন্দ্র'। আরেকটি কেন্দ্র ছিল ইরাক।

কিন্তু তাদের ইরাক তাদের চলার পথে পড়তো না। স্পেনবাসী মদীনা থেকেই ইলম অর্জন করতো। মদীনায় থাকতেন ইমাম মালিক (রহ.)। ইমামের ইন্তেকালের পর তার শাগরিদগন। মদীনা থেকেই স্পেনে মালেকি মাযহাবটা গিয়েছে।

আরেকটা কারণও হতে পারে:

-মরক্কো ও আন্দালুসের মুসলমানরা ছিল মরু জীবনে অভ্যস্ত। ইরাকের মুসলমানরা ছিলে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত। জীবনযাত্রার মিল-অমিল হিশেবে মদীনার পরিবেশে মরুজীবনের প্রভাব বেশি ছিল। যেটা ছিল না ইরাকে। স্বাভাবিকভাবেই আন্দালুসীয়রা মদীনার দিকেই বেশি ঝুঁকিয়েছে।

আরেকটা কারণ কথা বলা যায়:

-সময়ের সাথে তার মিলিয়ে, মালেকি মাযহাবের খুব বেশি বিবর্তন হয়নি। অন্য মাযহাবগুলোর সাথে শহরের সংস্পর্শ থাকার কারণে, প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছে। আগের সমাধান করা মাসায়েলকে পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে। এসব বিবেচনা-গবেষণা করতে গিয়ে অন্য মাযহাবের মুজতাহিদদের যোগ্যতা বেড়েছে, চিন্তা শাণিত হয়েছে, তাদের ফিকাহটাও সমৃদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু স্পেনের লোকেরা ইমাম মালেকের কথাকেই চূড়ান্ত ধরে বসে থাকার কারণে, চিন্তা ও ইজতিহাদ অন্য মাযহাবের মতো শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারে নি।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, সেখানকার লোকেরা অন্য মাযহাবকে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হতে দিতে বেজায় নারাজ ছিলো। তারা খুবই শক্ত হাতে অন্য মাযহাবকে শাসাতো-বানাতো।

\*\*\* অবশ্য স্পেনে মালেকি মাযহাবই প্রথম গিয়েছে এমন নয়। স্পেনে প্রথম গিয়েছে সিরিয়ার ইমাম আওয়ায়ীর (রহ.) মাযহাব। তারপরে এসেছে মিসরি ইমাম লাইস বিন সা'দের (রহ.) মাযহাব। পরে আস্তে আস্তে শাফেয়ী, আহলে যাহের, অল্প পরিমাণে হানাফী মাযহাবও প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু কোনও মাযহাবই মালেকি মাযহাবের অপ্রতিরোধ্য অবস্থানের সামনে টিকতে পারেনি।

\*\*\* একটা কারণ এটাও উল্লেখ করা যায়, স্পেনের খ্রিস্টানরা শুরু থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ ছিল। তারা সবাই ক্যাথলিক ছিল। খ্রিস্টবাদের অন্য কোনও রূপ স্পেনে জায়গা পায়নি। নিজেদের ঐক্যের স্বার্থের খ্রিস্টানরা ভিন্নমতকে স্থান দেয়নি। ধর্মীয় ঐক্যের কারণেই তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য অটুট ছিল। ক্যাথলিক পোপও সব সময় তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যেও এমন একটা চিন্তা কাজ করে থাকতে পারে, তাদের প্রতিপক্ষ ধর্মের দিক থেকে একটা মতাবলম্বী। এখন তাদের মধ্যে যদি ধর্মীয় ঐক্য না থাকে, রাজনৈতিক ঐক্য সংহত হবে না। এই যুক্তিটা অবশ্য খাটে না, কারণ স্পেনের মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবগত ঐক্য

থাকলেও, রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না বললেই চলে। শেষের দিকে, পুরো আন্দালুস অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

\*\*\* অবশ্য মালেকি মাযহাবের পথ একদম মসৃণ ছিল তা বলা যাবে না। অন্য মাযহাবের সাথে অনেক লড়াই করে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে হয়েছে। কখনো কখনো খলীফাকে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করে মাযহাবগত ঝগড়া মেটাতে হয়েছে।

\*\*\* কাসিম বিন সাইয়ার (২৭৬ হি.)। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মতাবলম্বী। তাকে অনেক যুদ্ধ করে স্পেনে টিকে থাকতে হয়েছিল। আমীর মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (২৭৭ হি.) তার কাজে খুশি হয়ে, তাকে নকলনবিশ নিয়োগ দিয়েছিলেন। তখন অবস্থানটা ময়বুত হয়েছিল।

\*\*\* বাকী বিন মুখাল্লাদ (২৭৬ হি.)। তিনি ছিলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রহ.) শাগরিদ। তার ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত নায়ক। তিনি সর্বপ্রথম স্পেনে মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা নিয়ে যান। ইমাম শাফেয়ীর (রহ.) কিতাবাদিও তিনিই প্রথম স্পেনে নিয়ে যান।

মালেকি ওলামায়ে কেরাম বাকী বিন মুখাল্লাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগল। তাদের কাছে এসব কিতাব একদম অপরিচিত ছিল। বা পরিচিত থাকলেও শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্যেই তারা কিতাবগুলোর বিরোধিতা করেছিল। ইবনে মুরতানীল (একজন স্পেনিশ আলিম) তো এমন কথাও বলেছিলেন:

-আমার বাক্সে ‘মুসান্নাফ’ থাকার চেয়ে শুকরের মাথা থাকাও অনেক ভাল।

\*\*\* বাকী বিন মুখাল্লাদের বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছল, মালেকিরা সাধারণ জনগনকে তার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিল। তিনি ভয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার সাহস করতেন না। এ ক্ষেত্রেও তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন আমীর মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ। তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে মুনায়ারার ব্যবস্থা করলেন। বাকী বিন মুখাল্লাদ প্রতিপক্ষকে বলতে গেলে একদম শুইয়ে দিলেন। আমীর মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন:

-এমন কিতাব তো আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারেও থাকা জরুরী। এটাকে জরুরীভিত্তিতে কপি করা হোক। আর হে বাকি! আপনি আপনার অর্জিত ইলম প্রচার করতে থাকুন।

আমীর এবার বিরোধীপক্ষকে তিনি শক্ত ভাষায় নিষেধ করে দিলেন, যেন বাকী বিন মুখাল্লাদের পেছনে আর না লাগে।

\*\*\* এ ঘটনা থেকেও বোঝা যায়, মাযহাবগত বিরোধ থেকে রাজনৈতিক বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার কোনও আশংকা ছিল না। না হলে আমীর এমন সিদ্ধান্ত দিতেন না।

\*\*\* একজন স্পেনিশ ঐতিহাসিকও চরম বিষয় প্রকাশ করে বলেছেন:

-সেই যে হিজরি দ্বিতীয় শতকে মালেকি মাযহাব স্পেনে এসেছিল, এগারশ হিজরিতে (সতেরশ খ্রি) মুসলমানরা স্পেন থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হওয়া পর্যন্ত এই মাযহাব টিকে ছিল। এটা এক আশ্চর্যের বিষয়।

\*\*\*স্পেনের সমস্ত মালেকি উলামা কউর ছিলেন, এমন নয়। অত্যন্ত উদার উলামাও ছিলেন। যেমন আবুল ওয়ালীদ আল বাজী (৪৭৪হি), ইবনে রুশদ (৫২০ হি), ইবনুল মুকরি (৫৫৭ হি)।

\*\*\* একটা বিষয় মজার, তা হলো, স্পেনে কৃষিক্ষেত্রে কিন্তু ইমাম আওয়ায়ীর মাযহাবই মানা হতো। কারণ এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের মাযহাব মানলে কৃষিক্ষেত্রে সমস্যা হতো। এ বিষয়টা নিয়ে দুই বছর আগে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম। ওটা খুঁজে পেলে যোগ করে দেব ইনশাআল্লাহ

\*\*\* একটা প্রশ্ন উঠতে পারে:

= মালেকি মাযহাবের প্রচন্ড চাপ কি স্পেনে মুসলমানদের পতনের অন্যতম একটা কারণ হতে পারে?

কোনও কোনও ঐতিহাসিক এমন মত পোষণ করেছেন। কিন্তু কিভাবে? মাযহাবগত বিরোধের সাথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিলুপ্তির কী সম্পর্ক?

এমন হতে পারে, বিজ্ঞান চর্চা এগিয়ে গেলেও, শৌর্যবীর্যের চর্চা কি কমে এসেছিল? তা হলেও, মাযহাবের সাথে তার কী সম্পর্ক?



## বই রিভিউ

স্পেনে মুসলমানদের উত্থান ও পতন  
রচনায়: অধ্যাপক ফজলুর রহমান  
প্রকাশনায়: পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, সিলেট।  
প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৬  
২য় সংস্করণ ২১শে গ্রন্থমেলা ২০১৮  
প্রচ্ছদ: বায়েজিদ মাহমুদ  
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১২  
ধরণ: ইতিহাস  
মুদ্রিত মূল্য: ৮০/=  
রেটিং ১০/৭.৫

ইতিহাস জাতির দর্পণ।  
যে জাতি তার পূর্বসূরীদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারেনা তারা সফলকাম হয় খুব কম।

একদা স্পেন তথা আন্দালুস ছিল আমাদের।  
আল হামরা প্রাসাদ, জাবালে তারিক তথা জিব্রাল্টার প্রণালী এগুলো ছিল আমাদের ঐতিহ্যের নিদর্শন।

বহন করে বেড়ায় আমাদের সোনালী অতীতের সুন্দর সব প্রতিচ্ছবি।

পৃথিবী চারটি জিনিষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত - জ্ঞানী গুণীদের জ্ঞান; মহান ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ বিচার;  
ধর্মপ্রাণদের প্রার্থনা ও যোদ্ধাদের নির্ভিকতা।

গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এই কথা গুলো লিখা ছিল।

বক্ষমান গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে লেখক খরচ করেছেন মোট ১১২ পৃষ্ঠা।

#প্রাথমিক শিরোনামে রচিত প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি জগতের রহস্য ও আল্লাহর প্রতিনিধি পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন লেখক।

এ অধ্যায়ে আরো আলোচনা করেছেন সংক্ষিপ্তভাবে খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামল ও উমাইয়া রাজ বংশের উত্থান-পতন।

১০ নং পৃষ্ঠার সংযুক্ত টিকায় লেখক বলেছেন: /"তাগুত কাফির থেকে মারাত্মক। কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করে। আর তাগুত আল্লাহর আনুগত্যে বাধা দেয়।"/ কোট করা অংশটি দেখতে কেমন লাগলেও বাস্তবতা অনস্বীকার্য।

#মুসলমানদের স্পেন বিজয় নামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন বর্তমান সময়ের স্পেন এর সার্বিক বিষয়ে।

ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে সচেতনতা কাম্য।

এ অধ্যায়ের ২৭ নং পৃষ্ঠার প্রথম দিকে লিখক দাবী করেছেন অষ্টম শতাব্দির প্রথম দিকে আমি আবার লিখছি অষ্টম শতাব্দির প্রথম দিকে তৎকালীন স্পেনের রাজা উইটিয়াকে হত্যা করে ডিউক রডারিক স্পেন দখল করে নিজেকে রাজা হিসেবে দাবী করেন। সে সময়কার প্রথা অনুযায়ী রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকদের

সন্তানরা রাজ দরবারে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য পাঠানো হতো। সে সুবাদে গভর্ণর কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যাকেও পাঠানো হলো। কিন্তু জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিভার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা রডারিক তার স্নীলতাহানি করেন। এ ঘটনায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে কাউন্ট জুলিয়ান তখনকার খেলাফতের দায়িত্বশীল ওয়ালিদের উত্তর আফ্রিকার গভর্ণর মুসা বিন নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের আবেদন জানান।

অতঃপর আবেদনে সাড়া দিয়ে খলিফার অনুমতি নিয়ে সেনাপতি তারেক বিন যিয়াদকে ১২হাজার সৈন্যসহ ৭১১খ্রিস্টাব্দে জলয়ান যোগে স্পেনে প্রেরণ করেন।

এখন বুঝার বিষয় হলো অষ্টম শতাব্দির প্রথম দিকের কোন কাহিনীর দরুণ যদি তারিক বিন যিয়াদ অভিযান পরিচালনা করে থাকেন তাহলে তো অভিযানের তারিখ হওয়া উচিত ছিল ৮১১ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু সঠিক তথ্য হলো ৭ম খ্রিস্টাব্দ এর প্রথম দিকে। আসলে বিষয়টা টাইপ মিসিং না কি ভুল ইতিহাস উপস্থাপন তা আমার বোধগম্য না।

#অধীনস্ত আরব আমিরাত নামে রচিত ৩য় অধ্যায়ে ৭১৪ থেকে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনে মুসলিম শাসকদের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন।

/"খ্রীষ্ট বাহিনী ধর্ম ও আধ্যাত্মিক রাজধানী রক্ষার্থে যুদ্ধ করে। আর মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করে ধন-সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিক পি.কে হিট্রি মন্তব্য করেনঃ খ্রীষ্টানদের নিকট তাদের চির শত্রু মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটি একটি যুগান্তকারী সাফল্য। যদি আরবগন যুদ্ধে জয়লাভ করত, তাহলে গীবন ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে প্যারিস ও লন্ডনের যেখানে গীর্জা রয়েছে সেখানে মসজিদ হতো"/।

কোট করা অংশ বক্ষমান গ্রন্থের ৩২ নং পৃষ্ঠার প্রথমার্শ। লেখক মুসলিম বাহিনীকে আগ্রাসী দাবী করেছেন উনার লেখায়। আদতে তা আদৌ সত্য নয়। আবার পরবর্তী অংশে এযুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভ হলে অনেক সফলতার সম্ভাবনা দেখেছেন স্বয়ং ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকরা।

আবার এদিকে ঐতিহাসিকরা খ্রীষ্টিয় শক্তির শত্রু হিসেবে দেখছেন মুসলমান জাতিকে অথচ পরের অংশেই লেখক জাতি হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন আরব জাতীয়বাদকে।

এবং ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে তথ্য পঞ্জি উল্লেখ করা যেখানে আবশ্যিক একটি বিষয় সেখানে তিনিও এগুলোও এড়িয়ে গেছেন নির্বিঘ্নে।

(এবিষয়ে আরো বিস্তারিত এ সঠিক তথ্য জানতে ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ইসলামের ইতিহাস ৩য় খন্ডের ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দেখুন।)

চতুর্থ অধ্যায় #[স্বাধীন আমিরাত](#)

পঞ্চম অধ্যায় #[স্পেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ](#)

ষষ্ঠ অধ্যায় #[স্পেন](#) ও ইউরোপের সভ্যতার বিকাশে মুসলমানদের অবদান

সপ্তম অধ্যায় #[স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান](#), মুসলিম নিধন, বিতারণ নির্যাতন।

অষ্টম অধ্যায় #[স্পেনে মুসলমানদের পতনের কারণ](#) হিসেবে প্রায় ২৩টি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

-বইটি কেন পড়বেন!

বইটি বেশ প্রাঞ্জল ছিল।

তবে ইতিহাস জানার জন্য আশাব্যঞ্জক উপস্থাপনার মাধ্যমে তা হয়না। আপনি একটা জাতির দীর্ঘকালের ইতিহাস নিয়ে লিখবেন আর তাতে সাফল্য বলে কিছু ছিলনা বললে ভুল হবে।

তবে আত্মসমালোচনা হিসেবে নিলে বইটি আপনার খোরাক যোগাবে বেশ।

alaminn5g

## খলিফা যখন কিতাবের কীট!

আইনুল হক কাসিমী

খলিফা হাকাম আল-মুসতানসির এর ইলমের হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর পিতা খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসিরের হাতে। হাকাম আল-মুসতানসির সে যুগের উল্লেখযোগ্য আলেমদের কাছে ইলম হাসিল করেন। আরবিভাষা, সাহিত্য, নাহ্ ও অংকশাস্ত্র হাসিল করেন মুহাম্মাদ আল-কুরতুবির কাছ থেকে। কুরআন-হাদিসের ইলম হাসিল করেন আল্লামা ইবনে আসবাগ থেকে। ইতিহাসের ইলম হাসিল করেন আলি আর-রুয়াইনি থেকে।

উলুমে ইসলামিয়া ও উলামাদের সংস্রবে লেগে থাকার কারণে তিনি ইলমের প্রতি চরম আসক্ত হয়ে পড়েন। এজন্য তিনি এমন একজন ইলমি ব্যক্তিত্বে পরিণত হন যে, উলামা ও ইতিহাসবেত্তারা তাঁর কথা ও মতকে সাদরে গ্রহণ করে নিতেন। তাঁকে 'দলিল' হিসেবে মানতেন। এমনকি 'আল-হাকাম' শব্দটাই দলিল হিসেবে যথেষ্ট হয়ে যেত! ইবনে আবদে রাঈহির জীবনি লিখতে গিয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ফুতুহ আল-হুমাইদি লিখেন, 'এটাই আমার দেখা আল-হাকামের হাতে লিখিত সর্বশেষ লিপি। তাঁর লিপি আহলে ইলমের কাছে দলিল। কেননা তিনি একজন নির্ভরযোগ্য আলেম।'

তিনি কিতাবের পোকা ছিলেন। কিতাব সংগ্রহ করা তাঁর নেশা ছিল। আন্দালুসের সম্রাট হওয়ার পাশাপাশি কিতাব জগতেরও সম্রাট ছিলেন। তৎকালীন সময়ের ইলমের স্বর্গরাজ্য কায়রো, দামেশক, বাগদাদ ও অন্যান্য শহরে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে চড়া মূল্য দিয়ে কিতাব খরিদ করাতেন। এভাবে তিনি তাঁর কুতুবখানায় চারলাখ কিতাব দিয়ে ঠেসে ফেলেছিলেন। কিতাব কিনতে কিনতে তাঁর কোষাগার উজাড় হয়ে এই কিতাবগুলো স্থানান্তরিত করতে ছয়মাস সময় লেগেছিল! তাঁর কুতুবখানার কিতাবাদির দাগনম্বরে জন্য ৪৪ টি রেজিস্টার খাতা ছিল। প্রতিটি রেজিস্টারে ৫০ টি পাতা ছিল!

তিনি শুধু কিতাব সংগ্রহ করে অধ্যয়নই করেননি; এসব কিতাবের ওপর তিনি নিজ হাতে অত্যন্ত মূল্যবান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টীকা সংযোজিত করেছিলেন। কিতাবে উল্লেখিত ব্যক্তিদের নাম, বংশ তালিকা, মৃত্যুসনসহ জরুরি বিষয়াবলি। এমনকি আজ-জাহরা শহরে কিতাব অনুলিখন করার একটি প্রকাশনালয় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার কুতুবখানা ও প্রকাশনালয়ের কর্মচারীরা পর্যন্ত সেসময় সমাজে খুবই সম্মান পেত। এমনকি মোটা অংকের ভাতা পেয়ে এরা অনেকেই পয়সাওয়ালা হয়ে গিয়েছিল!

তাঁর শাসনামলে শুধুমাত্র কর্ডোভায় মাদরাসার সংখ্যা ২৭- গিয়ে পৌঁছায়। এগুলোতে বিনা পয়সায় শিক্ষাদান করা হতো। এসব মাদরাসার মধ্য থেকে তিনটি মাদরাসা ছিল মসজিদভিত্তিক এবং বাকি ২৪ টি ছিল কর্ডোভার বিভিন্ন জনপদে। সবগুলোর সাথে কুতুবখানা ছিল। সবগুলো মাদরাসায় বেতনভোগী আলেমদের অবস্থান ছিল। তিনি মুসলিমদের শিশুশিক্ষায় খুব বেশি গুরুত্বারোপ করতেন।

উল্লেখ্য, হাকাম আল-মুসতানসির (৯৬১-৯৭৬ খ্রি.) ছিলেন আন্দালুসের কর্ডোভা খিলাফতের দ্বিতীয় খলিফা। আন্দালুসি ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় হাকাম নামে পরিচিত। তৃতীয় আবদুর রহমান এর পুত্র। ইলমের প্রতি আসক্তির কারণে খ্রিষ্টানদের সাথে জিহাদ ও বিজয় অর্জনে ভাটা পড়েছিল বলে কোনো কোনো হিংসুক প্রাচ্যবিদ মিথ্যাচার চালিয়েছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো যে, রোমকদের সাথে তাঁর নিয়মিত যুদ্ধ লেগেই থাকত। তাঁর ভয়ে অনেক ক্রুসেডার সন্মুখ ও শাসক শান্তিচুক্তি করে রাখত। তাঁকে সমীহ করে চলত।

-----

সূত্রাবলি:

- ১- ৮২০- في التاريخ العباسي والأندلسي, আহমাদ মুখতার আব্বাদি
- ২- ১/৩৯৫, نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب, আহমদ আল মাক্কারি
- ৩- ১০১- جذوة المقتبس في ذكر ولاية الأندلس, মুহাম্মদ আল হুমাইদি
- ৪- ১/২০১, الحلة السيرة, ইবনুল আব্বার
- ৫- ১/৪৪, الحلة السيرة, ইবনে হাজাম

# আন্দালুসি ললনার গল্প শোনো .....

আইনুল হক কাসিমী

মারাম্মাহ। আন্দালুসের ঐতিহ্যবাহী একটি সুঁইয়ের নাম। আন্দালুসি ললনারা এই মারাম্মাহ দিয়েই কাপড়ের গায়ে, মনের মাধুরী মিশিয়ে ঐঁকে দিত আল্লনা। প্রস্তুত হয়ে যেত নকশিকাঁথা, রঙিন রুমাল, বাহারি আল্লনার কাপড়। যে ঘরে এরকম সুঁই পাওয়া যেত, সে ঘরকে বলা হত- মারাম্মাহ কুটির। আন্দালুসের গ্রামীণ ঘরগুলোর অন্যতম একটি উপাদান ছিল এই মারাম্মাহ। আন্দালুসের একটি প্রবাদবাক্য ছিল- 'খাতাবতাল মারআহ ওয়াল মারাম্মাহ'। ওই পুরুষকে বলা হত, যে সুঁই দিয়ে ভালো করে সেলাই করতে পারদর্শী কোনো ললনাকে বিয়ের পয়গাম দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করত!

আন্দালুস থেকে বিতাড়িত হয়ে মরক্কোয় আশ্রয় নেয় আন্দালুসি মুসলমান। সাথে এই মারাম্মাহও নিয়ে আসে। এজন্য আজও দক্ষিণ মরক্কোর গ্রাম, গঞ্জ, শহর, নগর ও বন্দরে এই মারাম্মাহ পাওয়া যায়। আজও দক্ষিণ মরক্কোর ললনারা এই মারাম্মাহ দিয়ে নকশিকাপড় সেলাই করে তাদের প্রাচীন আন্দালুসি ঐতিহ্য জীবন্ত করে রেখেছে। আন্দালুসের প্রাচীন ওই প্রবাদবাক্য এখনও দক্ষিণ মরক্কোয় লোকমুখে শোনা যায়।

এই মারাম্মাহর উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন কিতাবাদিতে। বিশ্বপর্যটক ইবনে বতুতার সফরনামায় মারাম্মাহর আলোচনা উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, ওয়াল্লাতাহ ও মালির রাস্তার মধ্যে তিনি একটি বটগাছের অভ্যন্তরে একজন দর্জি দেখতে পেয়েছেন, যে তার মারাম্মাহ দিয়ে কাপড় বুনন করে চলছে! আরেক পর্যটক ইবনে জুযা গ্রানাডি বলেছেন, 'আন্দালুসে দুটি বটগাছ আছে। যার অভ্যন্তরে দুজন দর্জি রয়েছে। যারা সেখানে কাপড় বুনন করে। একটি আশ উপত্যকায়। আরেকটি গ্রানাডার বুশাররায়।

ওহ আরেকটি মজার কথা রয়েছে। সেটি হলো, যখন কোনো আন্দালুসি ললনার বিয়ের শানাই বেজে উঠত, তখন যৌতুকসামগ্রীর মধ্যে একটি অন্যতম সামগ্রী থাকত, রেশম, মখমল ও উলের নকশিকরা রঙিন চাদর। ডোরাকাটা গাঢ় পরদা। এগুলো ছাড়া তাদের বিয়েই হত না। এমনকি কোনো ললনা দরিদ্র হলে, গ্রামের বুড়িরা সাহায্য করত। তবুও ওই দরিদ্র ললনার বিয়েতে নকশিকরা চাদর ও পরদার কাপড় উপহার প্রদান করত!

-----  
সূত্র: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, ইবনে বতুতা রহ.



# বিদায়ী বিলাপ!

আইনুল হক কাসিমী

শাহজাদি মারয়ামা (১৪৬৭-১৪৯৩)। ইবরাহিম বিন আলি আল আভারের আদুরে কন্যা। ইবরাহিম বিন আলি আল আভার ছিলেন কেস্টিলের খ্রিষ্টানদের সাথে আন্দালুসের শেষকালের লড়াকুদের এক অন্যতম লড়াকু সৈনিক। ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে কেস্টিলের খ্রিষ্টানরা যখন লোজা শহরে আক্রমণ করে, তখন তিনিই ছিলেন মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার। সেই হিসেবে শাহজাদি মারয়ামার দেহের শিরা-উপশিরায় বহমান ছিল আত্মমর্যাদাশীল পিতার শোণিত রক্তকণিকা।

কিন্তু ভাগ্যের কী লিখন, এই শাহজাদি মারয়ামাকে হতে হয়েছিল এক ভীরা সম্রাটের ঘরণী! গ্রানাডার শেষ মুসলিম সম্রাট আবু আবদুল্লাহর স্ত্রী। ১৪৯২ সালে আবু আবদুল্লাহ কেস্টিল সম্রাট ফার্ডিনেন্ড ও রাণী ইসাবেলার হাতে গ্রানাডার চাবি তোলে দিয়ে আটশ বছর ধরে আন্দালুসে মুসলিমদের শাসনের কবর রচনা করেন। এরপর মারয়ামা স্বামী, সন্তান, শাশুড়ি ও ননদের সাথে লোজা শহরে বসবাস করেন।

পরের বছর ১৪৯৩ সালের অক্টোবরে ভীরা আবু আবদুল্লাহ আন্দালুস ছেড়ে চিরতরের জন্য মরক্কোর দিকে পাড়ি জমানোর প্রস্তুতি শুরু করেন। আন্দালুস হারানোর শোকে শাহজাদি মারয়ামা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। দিনদিন তার অসুস্থতা বাড়তে থাকে। একসময় শয্যাশায়িনী হয়ে পড়েন। স্বামীর আন্দালুস ছেড়ে পাড়ি জমানোর প্রস্তুতির প্রাক্কালে ২৬ বছর বয়সে তিনি লোজা শহরে মারা যান!

পরবর্তীকালে স্প্যানিশরা লোজা শহরে, আন্দালুস হারানোর শোকে মুহ্যমানা ও স্বামীর পরিণতি চিন্তা করে বিলাপরত শাহজাদি মারয়ামার ভাস্কর্য তৈরি করে। এটা তৈরি করে তারা শাহজাদি মারয়ামার লোজা শহর ছেড়ে যাওয়ার বিদায়ী বিলাপ ও দুঃসহ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখে! ভাস্কর্যটি তৈরি করে প্রসিদ্ধ স্প্যানিশ শিল্পী ফ্রান্সিসকো মারটিনেজ ডে লা রোসা। ভাস্কর্যটি আজও স্পেনের লোজা শহরে কালের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।

-----

সূত্র: دولة الإسلام في الأندلس - ২৭৮, আবদুল্লাহ আনান

# । এক ঐতিহাসিক মিথ্যার অবসানঃ ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকার আবিষ্কারক নয়.....।

আইনুল হক কাসিমী

ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী, দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা দীর্ঘদিন থেকে, এই দাবি করে আসছিল যে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকার আবিষ্কারক নয়। বরং তার আগমনের আগে থেকেই দক্ষিণ আমেরিকায় আদী লোকের বসবাস ছিল। বরং সে একজন জলদস্যু। চরম অপরাধী। দক্ষিণ আমেরিকার মূল অধিবাসীদের হস্তক! সুতরাং লস এঞ্জেলসে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ভাস্কর্য সরিয়ে ফেলতে হবে।

দক্ষিণ আমেরিকার জনগণের দাবি অনুযায়ী আদালত এই রায় দেয় যে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকার আবিষ্কারক নয়। সে একজন জলদস্যু ও অপরাধী। সেই হিসেবে লস এঞ্জেলস থেকে আমেরিকার কথিত আবিষ্কারক ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ভাস্কর্য সরিয়ে ফেলা হলো! উল্লেখ্য, পোস্টের শেষে টুইটার লিংক থেকে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ভাস্কর্য সরিয়ে ফেলার এবং আমেরিকান আন্দোলনরত জনগণের হৈছল্লোড়ের ভিডিওটেপ দেখতে পারেন।

আমেরিকানরা আজ স্বীকার করছে, অথচ আমরা সেই কখন বলেছি যে, আমেরিকার আবিষ্কারক ক্রিস্টোফার কলম্বাস নয়; আমেরিকার আবিষ্কারক মুসলমান! কলম্বাসের ৬০০ বছর আগে নবম শতাব্দীতে আজকে যে দেশ আমেরিকা, সে অঞ্চলে অবতরণ করেন আন্দালুসের একদল ভ্রমণবিলাসী মুসলিম। তারা স্পেন থেকে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে যাত্রা করেন আমেরিকার উদ্দেশে। আবিষ্কার করেন এক নতুন পৃথিবী। যা আজকের আমেরিকা। এটা খলিফা আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদের (৮৮৮-৯১২) শাসনামলে।

প্রসিদ্ধ মুসলিম ঐতিহাসিক আলি ইবনুল হাসান আল মাসউদি তাঁর অমর গ্রন্থ 'মুরুজ জাহাব' এর মধ্যে বলেন, 'কর্ডোভার মুসলিম নাবিক খাশখাশ ইবনে সাইদ ইবনে আসওয়াদ ২৭৬ হিজরি, মৃতাব্দে ৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের ডেলভা (বর্তমান প্যালস) থেকে জাহাজে পাল তুলে, অন্ধকার সাগর তথা আটলান্টিক পার হয়ে 'আরজে মজহুল' বা অজানা দুনিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। এরপর ফিরে আসেন আশ্চর্যজনক সব ধনরত্ন নিয়ে।' এই অজানা দুনিয়াই হলো আজকের আমেরিকা!

আন্দালুসে সংরক্ষিত এসব মানচিত্র ও দলিলপত্র উদ্ধার করে রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলার শাসনামলে ১৪৯২ অথবা ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকায় যাত্রা করেন। আর

এখান থেকেই পশ্চিমা মিথ্যুক ঐতিহাসিকরা নতুন পৃথিবী বা আমেরিকা আবিষ্কারের ক্রেডিট তাদের পকেটে নিয়ে নেয়! কিন্তু সত্য একদিন না একদিন উদ্ভাসিত হয়। আজ তা হয়েই গেল!

-----

ভিডিওটোপের লিংক- <https://twitter.com/Amirhqatif/status/1064891568061145088>

ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র: مجلة آفاق الثقافة والتراث الإماراتية, সংখ্যা- ৬৯, মে, ২০১০ ইসাযি

alammin5g

## স্বর্ণখচিত জবাব!

আইনুল হক কাসিমী

৪২২ হিজরি মুতাবেক ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভায় উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে। এরপর থেকে আন্দালুসের সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে আগের সেই শৌর্যবীর্য বাকি থাকেনি। রাজত্ব আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে মুসলিমরা লড়া শুরু করে একে অপরের বিরুদ্ধে। ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হাত রঞ্জিত হতে থাকে। আর এই সুযোগ গ্রহণ করতে লাগে পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান রাজ্যগুলো। ক্যাষ্টেলের খ্রিষ্টান সম্রাট ফার্ডিনান্ড কয়েকটি মুসলিম রাজ্য দখল করে নেন। তারপর ক্ষমতায় আসেন ষষ্ঠ আলফানসো। ৪৭৮ হিজরিতে ষষ্ঠ আলফানসোর হাতে পতন হয় টলেডোর। এরপর আর কখনই টলেডোতে ইসলামি নিশান পতপত করে ওড়তে দেখা যায়নি!

সেভিলের শাসক ছিলেন মু'তামিদ বিন আক্বাদ (১০৬৯-১০৯১)। তিনি ছিলেন বনি আক্বাদ শাসকদের মধ্যে তৃতীয় ও শেষ শাসক। ষষ্ঠ আলফানসো এবার সেভিল অবরোধ করেন। তিনি মু'তামিদ বিন আক্বাদের সাথে পত্রালাপ করেন। চাইলে মু'তামিদ বিন আক্বাদ অন্যান্য মুসলিম রাজ্যগুলোর মতো টেক্স দিয়ে আলফানসোর বশ্যতা স্বীকার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদাবান একজন শাসক। তিনি আলফানসোর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। অবরোধ চলতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে। আলফানসো মু'তামিদ বিন আক্বাদের কাছে পত্র লিখে বলেন- 'অবরোধ দীর্ঘ হচ্ছে। এখানে গরম বড় তীব্র, আর মাছির উপদ্রব খুবই বেশি! আমার জন্য একটি পাখা পাঠান। যেন বাতাসে করতে পারি এবং মাছি তাড়াতে পারি।'

আলফানসো বুঝতে চাচ্ছিলেন- অবরোধ করতে তার আপত্তি নেই। মুসলিম বাহিনী নিয়েও তিনি চিন্তিত নন। বরং এ মুহুর্তে মাছিই তাকে বেশি পেরেশান করছে। পত্রটি হস্তগত হলো মু'তামিদ বিন আক্বাদের। তিনি পত্রের উলটো পিঠে লিখে দিলেন- 'তোমার পত্র পেয়েছি। শীঘ্রই আমি তোমার জন্য লামতি চামড়ার পাখা পাঠাব। এ পাখা থাকবে মুরাবিত সৈন্যদের হাতে। এ পাখার বাতাস আমাদেরকে তোমার হাত থেকে স্বস্তি দেবে, কিন্তু তোমাকে কোনো স্বস্তি দেবে না!'

মুরাবিতরা তখন উত্তর আফ্রিকা শাসন করছিলেন। তাদের মহামান্য আমির ছিলেন উম্মাহর শিংহশাবক ইউসুফ বিন তাশফিন। তাঁর শক্তিমত্তা, দাপট আর শৌর্যবীর্যের গল্প শোনা যায় সুদূর আন্দালুস থেকেও! মু'তামিদ বিন আক্বাদ সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি ইউসুফ বিন তাশফিনকে পত্র লিখবেন। তাঁকে বলবেন, একবার অন্তত আন্দালুসে এসে মুসলিম ভাইদের সাহায্য করতে।

মু'তামিদ তাঁর সভাসদদের নিজের সিদ্ধান্ত জানালেন। কিন্তু কেউ কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত স্বাগত জানালেও অনেকেই প্রতিবাদ করল। বিশেষ করে বিভক্ত রাজ্যসমূহের শাসকরা তাঁর সিদ্ধান্ত শুনে নাখোশ হলো। তারা বারবার তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে বুঝাতে লাগল যে, তিনি যেন ইউসুফ বিন তাশফিনের সাহায্য না চান।

যুবরাজ আবুল হাসান উবাইদুল্লাহ ছিলেন মু'তামিদ বিন আক্বাদের ছেলে। তিনিও এ বিষয়ে পিতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিভক্ত রাজ্যের মুসলিম শাসকদের সুরে সুর মিলিয়ে তিনিও পিতাকে বুঝাতে লাগলেন। কিন্তু ইউসুফ বিন তাশফিনকে ডেকে আনতে মু'তামিদ বিন আক্বাদ ছিলেন অনড়। পুত্রের আপত্তির প্রতিউত্তরে তিনি এমন একটি স্বর্ণখচিত জবাব দিয়েছিলেন, যা আজও ইতিহাসে সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে। আবুল হাসান উবাইদুল্লাহ বলেছিলেন-

-আপনি যে মুরাবিতদেরকে ডেকে আনছেন, তারা তো একসময় আপনার ক্ষমতাও ছিনিয়ে নেবে! তখন কী করবেন?!

-বেটা! আমি তো ইসলামের এই ভূমিকে কুফুরের ভূমিতে পরিণত হতে দিতে পারি না। আমি এ ভূমিকে খ্রিষ্টানদের হাতেও ছেড়ে দিতে পারি না। এমনটা যদি হতে দিই, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা আমার ওপর কি অভিশাপ দিতে থাকবে না?! খোদার কসম, মারাকেশের সুলতানের উট চরানো আমার কাছে অধিক প্রিয়, খ্রিষ্টানদের শূকর চরানোর চেয়ে!

মু'তামিদ বিন আক্বাদের ডাকে লাক্সাইক বলে আগমন করেন সুদূর উত্তর আফ্রিকা থেকে মুরাবিত নেতা ইউসুফ বিন তাশফিন। ৪৭৯ হিজরি, মৃতাবেক ১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর, শুক্রবার সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক যাল্লাকার যুদ্ধ। মু'তামিদ বিন আক্বাদ সে যুদ্ধে অত্যন্ত বীরদর্পে জিহাদ করেন। ইউসুফ বিন তাশফিনের রণকৌশলে মৃত্যুঞ্জয়ী নির্ভীক মুজাহিদরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্রুশের পূজারি ষষ্ঠ আলফানসোর সৈন্যদের চোখে শর্ষেফুল দেখাতে লাগেন। অবশেষে বিজয় এসে পদচুম্বন করে ইউসুফ বিন তাশফিনের।

-----  
সূত্রাবলি:

১- فجر الأندلس, ১৩৯-২৮০, ড. হুসাইন মুআনিস

২- قصة الأندلس من الفتح الى السقوط, ১/৩৬৫, ড. রাগিব সারজানি

৩- نفح الطيب في غصن أندلس الرطيب ১/৫৬৬, ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ মাক্কারি

# ও! আন্দালুস

- তানভীর মাহমুদ

৫২৭ বছর  
দীর্ঘ অপেক্ষা;  
সেই পুরনো রাস্তা  
সেই পুরনো দেওয়াল।  
.

বিমূর্ত হৃদয়  
ছুঁয়ে যায় আশ্বেপ,  
দূরত্ব রাড়ে ধীরে  
শেষে বিচ্ছেদ।  
.

অস্থাবর আবাসে  
খুঁজেছি স্থবিরতা,  
হঠাৎ সুনামির আঘাত  
আঙুলটাও ধরে রাখিনি।  
.

আকাশচুম্বী মিনার নিচে  
বসে জ্ঞানের আলাপ,  
সন্তুষ্ট চিতে ছিলাম  
আমি বেথেয়াল।  
.

জিয়াদ প্রণালির মুগ্ধতা;  
চারদিকে উষ্ণ বিছানা,  
সময়ের পালায় তাই  
ভুলতে বসেছি তোমায়।  
.



সবুজ আর কারুকার্য  
সবার জন্য উন্মুক্ত;  
প্রাচীর বসাইনি সামনে পিছনে  
যা ছিল সবই প্রকৃতির।

ঝড়ের আগে বহু বিবোধ  
অপরের বিরুদ্ধে হাঁকডাক;  
জমা তুষারে একটু গরম  
সেই তো শুরু অধঃপতন।

মনে পড়ছে সেই গিরিপথ  
শিক্ষায় বুনা সভ্যতা,  
মাটিতে চাষাবাদ  
আহ! বড় দুর্দিন আজ।

প্রবল বেগে হানা দিল  
পাহাড়সম ঢেউ,  
ঈমান তলানিতে; নেতৃত্বে গোলযোগ  
ভূমিতে মিলল না ঠাই।

কোনমতে দিলাম পাড়ি  
সাগরে তরী; ভিড়লাম মাগরেব,  
সাহস হয়নি ফিরে তাকানোর  
স্মৃতিও ভুলে গেছে সিন্দারাদ।

বজ্রের শব্দে আজ  
মনে পড়ল সব,  
চারদিক থেকে ধ্বনি শুনি  
ভোগ করতে আমার মাংস।

তোমায় অনুভব করি  
আমি দুর্ভাগা,  
আশেপাশে তাকিয়ে দেখি  
নর-নারী,শিশু বাহারি সুখে।

সবাই ভুলে গেছে  
মনে করতেও লাগে ভয়,  
যদি এ স্থান ছেড়ে মাঝপথে  
কারণাগারে জায়গা হয়।

পচা হৃদয় নিয়ে বেড়েয়েছি  
মরিচীকার খবর জানি,  
খুব সুন্দর টোপ  
তবুও সতর্ক হুঁতুর।

একটি ঘোড়া,একটি তরবারি  
একা মুসাফির বড্ড ক্লান্ত;  
যে মরুপথ ধরে আসা  
সে পথে ফেরার বাসনা।

তবুও সেই ঘ্রাণ আসে  
নাকে লাগে হালকা,  
হয়ে উঠব সজাগ  
সময় ঘনিয়ে আসছে।

অপেক্ষায় রেখেছি তোমারে  
দেখবে আমি আসব,  
ধ্বংস গড়ার মধ্যদিয়ে  
তোমার কাছে ফিরব।

২৫-১২-২০১৮

## প্রথম হিশাম ও প্রথম হাকাম

আন্দালুসের প্রথম আমীর আব্দুর রহমান আদ-দাখিল এবং তার পুত্র হিশাম খুবই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। হিশাম ছিলেন পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, তবু তার পিতা তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন কারণ হিশাম ছিলেন বিচক্ষণ, ধার্মিক এবং অন্যান্য ভাইদের চেয়ে বেশি যোগ্য।

কোথা থেকে হিশাম এক ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলেন তিনি মাত্র ৮ বছর রাজত্ব করবেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী তার জীবনের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। হিশাম সত্যিই মাত্র ৮ বছর শাসন করে ৪০ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। এই ৮ বছর তিনি ইহকালীন লাভের চেয়ে পরকালীন লাভকে বেশি প্রাধান্য দেন।

তিনি ইমাম মালিকের ভক্ত ছিলেন মতান্তরে শিষ্য। হিশাম ইমাম মালিকের মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করেন। হিশাম যখন ৭৮৮ সালে ক্ষমতায় বসেন তখনও ইমাম মালিক জীবিত। ইমাম মালিক মারা যান ৭৯৫ সালে। এর পরের বছর ৭৯৬ সালে হিশাম মারা যান।

ইমাম মালিকের মাযহাব টিকে থাকা ৪ মাযহাবের মধ্যে অন্যতম হওয়ার পেছনে হিশামের ভূমিকা অনেক বেশি, ইমাম আবু ইউসুফের কারণে যেমন হানাফি মাযহাব প্রসিদ্ধি পেয়েছে, হিশামের কারণে মালিকী মাযহাব।

হিশামকে মুঘল সাম্রাজ্যের হুমায়ূনের সাথে তুলনা করা যায়। হুমায়ূন যেমন পিতা বাবুরের রেখে যাওয়া সাম্রাজ্যকে ধরে রেখেছিলেন, বৃদ্ধি ও সুসংহত করেছিলেন, হিশামও তেমনি পিতা আব্দুর রহমানের আমিরাতকে শক্তিশালী করেছিলেন। হুমায়ূনের ভাইয়েরা যেমন হুমায়ূনের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ করেছিলেন তেমনি হিশামের ভাইয়েরাও তার বিরোধিতা ও বিদ্রোহ করেছিলেন।

হিশামের ৮ বছরের শাসনামলে অনেকগুলো বিদ্রোহ হয়, আর হিশাম সেগুলো দমন করে আমিরাতকে রক্ষা করেন। হিশামকে উমাইয়া খলীফা উমার বিন আব্দুল আজিজের সাথে তুলনা

করা হয়। উমারের মত তিনিও শরঈ শাসনকে সুদৃঢ় করেন। আলিম ফুকাহাদের প্রাধান্য দিতেন। আলিম ও ফকীহদের মত নিয়েই দেশ চালাতেন।

কিন্তু হিশামের মৃত্যুর পর তার পুত্র হাকাম ক্ষমতায় বসে সব পাল্টে দেন। মদাসক্ত হাকাম নিজের ইচ্ছেমত দেশ পরিচালনা শুরু করেন, ফকীহদের ক্ষমতা কেড়ে নেন। ফলে আমিরাত হয়ে উঠে শ্রেফ রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্র, আলিম ও ফকীহরা এর বিরোধিতা করলে তাদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। ফকীহরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু হাকাম তা শক্ত হাতে দমন করে। এভাবেই শুরু হয় আলিম ও ফকীহদের বাদ দিয়ে স্পেনে রাজতান্ত্রিক শাসন। হিশামকে যদি হুমায়ূনের সাথে তুলনা করা যায় তাহলে হাকামকে আকবরের সাথে , যদিও হাকাম আকবরের মত মুরতাদ ছিল না।

হাকাম দীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্ব করেন ফলে এর প্রভাব পরবর্তীতে বজায় থাকে। হাকামের মাধ্যমেই প্রথম আন্দালুসের মুসলিম শাসন তার অবস্থানচ্যুত হয় যা পরবর্তীতেও তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি।

alaminnok

## আন্দালুসের পতন ও উসমানীয় খিলাফাহ

১৪৯২ সালে স্পেনে মুসলমানদের পতন হয় তখন উসমানীয় সুলতান ২য় বায়েজিদ ইনকুইজিশনের হাত থেকে স্পেনের মুসলিম ও ইহুদীদের বাঁচাতে কামাল রেইসকে পাঠান এবং তাদের নিয়ে এসে আশ্রয় দেন। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু আন্দালুসকে আবার জয় করার ব্যাপারে বায়েজিদ কিংবা তার পরবর্তী বংশধরদের কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না।

বায়েজিদ একজন বীরের সন্তান ছিলেন, কনস্টান্টিনোপল-বিজেতা মুহাম্মাদ আল ফাতিহের পুত্র ছিলেন বায়েজিদ। কিন্তু নিজের দায়িত্ববোধ স্পেনের মুসলিমদের আশ্রয় দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। বায়েজিদের পুত্রও একজন বীর ছিলেন, ইয়াভুজ সেলিম। সেলিম ছিলেন উসমানীয় প্রথম খলীফা। তিনি ১৫১৭ সালে মিশর বিজয় করে মামলুকদের পরাজিত করেন, নিজেকে খলীফা ঘোষণা করেন, মক্কা মদিনার খাদেম হয়ে গর্বিত হন। আর ওদিকে পারস্যে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক শিয়া সাম্রাজ্য, সাফাভি সাম্রাজ্য। আবার মধ্য এশিয়া থেকে গিয়ে ভারতে বাবুর গড়ে তুলেন মুঘল সাম্রাজ্য। চারিদিকে এতো মুসলিম সাম্রাজ্য, তবু হারানো আন্দালুস নিয়ে কারোই মাথাব্যথা ছিল না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারে মুসলমান প্রতিপক্ষকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টান ইউরোপ ছিল ঐক্যবদ্ধ।

কনস্টান্টিনোপল-বিজেতা মুহাম্মাদের স্বপ্ন ছিল খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আশ্রয় রুমকেও বিজয় করবেন, কিন্তু তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, তিনি রুম বিজয় করার আগেই মারা যান। মুহাম্মাদের স্বপ্ন পূরণে বায়েজিদ বা তার পুত্র সেলিমের আগ্রহ বা পরিকল্পনা ছিল না। মুহাম্মাদের স্বপ্ন আবার জেগে উঠে তার প্র-পৌত্রের মধ্যে। ১৫২০ সনে সুলাইমান হন উসমানীয় সুলতান। উসমানীয় দ্বিতীয় খলীফা।

রুম বিজিত হলে অবশ্য আন্দালুস বিজয় আরও সহজ হয়ে যেতো। কিন্তু রুম বাদ দিয়ে আন্দালুস বিজয় সম্ভব ছিল না। কারণ ইউরোপের এক মাথায় তুরস্ক, অন্য মাথায় স্পেন। উমাইয়ারা স্পেনে ঢুকেছিল মরক্কো দিয়ে, অর্থাৎ আফ্রিকা দিয়ে। আর তুরস্কে উসমানীয়রা এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে।

যাই হোক, সুলাইমান রুম বিজয়ের স্বপ্ন লালন করতেন, তাই বারবার হানা দিতেন ইউরোপে। হাঙ্গেরি পর্যন্ত বিজয় করতে পেরেছিলেন। এরপর আগে বাড়তে পারেন নি। তার রুম বিজয়ে পানি ঢেলে দেয় সাফাভীরা। সাফাভিদের সাথে অপ্রয়োজনীয় অনেক যুদ্ধ হয়, সময় নষ্ট হয়, আর ওদিকে ইউরোপ শক্তিশালী হয় নিজেদের হারানো অঞ্চলগুলো দখল নিত।

এছাড়াও সুলাইমানের রুম বিজয় হয়নি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে। সাম্রাজ্য ছিল বিশাল, তাই বিদ্রোহও হতো বেশি, ঐক্যের চেয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ছিল বেশি। সুলাইমানের এই স্বপ্ন তার যোগ্য পুত্র মুস্তাফার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মারপ্যাঁচে মারা পড়ে পার্গালি, মুস্তাফা, বায়েজিদের মত রুম বিজয়ের স্বপ্নিকরা। এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সুলাইমান অজ্ঞাত থাকলেও হত্যাগুলোর জন্য তাকেই দায়ি করা হয়, সুলাইমান নিজেই নিজেকে পঙ্গু করেছিলেন, নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে নিজেই শেষ করে দিয়েছিলেন।

সুলাইমান শেষ বয়সে ইউরোপেও ভালো অবস্থান ধরে রাখতে পারেন নি, যার ফলে অযোগ্য পরবর্তী বংশধরদের হাতে হারিয়ে যায় বিশাল সাম্রাজ্য। রুম যদি সত্যিই জয় করতে পারতেন তবে আজ ইউরোপ থাকতো আমাদের। এক কথায় পুরো পৃথিবী থাকতো মুসলমানদের। রুম বিজিত হলে আন্দালুসও ফিরে পেতাম আমরা।

রুম একদিন অবশ্যই মুসলমানদের হবে ইনশাআল্লাহ্, সাথে আন্দালুসও। কিন্তু সেই বিজয়ী কাফেলায় আমরা থাকবো কি?

alaminn5g



# জে সুইস বালাতুশ শুহাদা!

আতিক উল্লাহ

দিনলিপি-৩৭৯  
(১৫-১১-২০১৫)

--

কোনটা ছেড়ে কোনটা দিয়ে শুরু করি! তাই একক শিরোনাম দেয়া সম্ভব হলো না। আরও কয়েকটা শিরোনাম বাদও পড়ে গেছে:

ক: আবদুর রহমান গাফেকী: আনসাও হিরো!

খ: টুরস: মুসলিম-ফরাসি সংঘাত!

গ: ফ্রান্সের বর্বর হত্যাকাণ্ডে আমাদের ‘কনডোলেস’!

ঘ: মুসলিম বিশ্বে ফরাসী আগ্রাসন!

ঙ: ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সূত্র!

--

শুধু শিরোনাম দিয়েই বিশাল পোষ্ট সাজিয়ে ফেলা যাবে। তবুও আবেগের বেগ ফুরোবার নয়। কিছু কষ্ট আছে সারাশ্রু মনের মধ্যে খচখচ করে। চোরা কাঁটার মতো। ‘বালাতুশ শুহাদা’ শব্দটাও এমনি এক ‘চোরাকাঁটা’।

উমার বিন আবদুল আযীয (রহ.) এর খিলাফতকাল হলো ৭১৭ থেকে ৭১৯ সাল। তিনি দায়িত্ব নিয়েই একটা অসাধারণ সিদ্ধান্ত নেন। সামাহ বিন মালিককে আন্দালুসের গভর্নর নিয়োগ করেন। এর আগে আন্দালুস সাধারণত আফ্রিকার অধীনে থাকতো। উমার বিন আবদুল আযীযের আগের খলীফারাও আন্দালুসে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতেন। কিন্তু উমার প্রথমেই আন্দালুসকে সরাসরি কেন্দ্রের অধীনে নিয়ে আসেন।

মুসা বিন নুসাইর (রহ.)। তিনি আন্দালুসে অভিযান চালিয়ে যেতে যেতে ফ্রান্সের অভ্যন্তর ভাগে পৌঁছে গিয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিমের ‘উরবুনা’ শহর পর্যন্ত দখল করেছিলেন। সামাহ বিন মালিক দায়িত্ব পেয়ে আবার অভিযান শুরু করলেন। তিনি ফ্রান্সের পুরো উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল দখল করে ফেলেন।

পাশাপাশি ইসলামের প্রচারও চালিয়ে যেতে থাকেন। দিকে দিকে দায়ী প্রেরণ অব্যাহত রাখেন। ৭২১ সালে তুলসের ময়দানে সামাহ শহীদ হন।

-----

আবদুর রাহমান:

তিনি ছিলেন ইয়ামনের মানুষ। পড়াশোনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.)-এর কাছে। একজন তাবীয়ী যা যা গুণাবলী থাকা দরকার তার মধ্যে সবই ছিল।

আবদুর রাহমান এক প্রতিনিধি দলের সাথে, উমাইয়া খলীফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিক (৭১৪-৭১৭)-এর দরবারে, দিমাশকে আসেন। কিছুদিন সেখানেই অবস্থান করেন। পরে মরক্কোতে চলে আসেন। মুসা বিন নুসাইর ও মুসার ছেলে আবদুল আযীযের সাথে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যোগ দেন। কিছুদিন আন্দালুসের পূর্ব-উপকূলীয় এলাকার শাসনের দায়িত্বও পালন করেন।

সামাহ বিন মালিকের বাহিনীর সাথে তিনিও ছিলেন। সামাহ শহীদ হওয়ার পর, সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। সবাই মিলে আবদুর রাহমানকে নেতা নির্বাচন করে। দায়িত্ব পেয়েই তিনি সব সৈন্যকে একত্র করেন। নিরাপদে ফিরে আসেন। ফিরে আসার কাজটা ছিল তার অনন্য কৃতিত্ব। কারণ, খ্রিস্টান বাহিনী পদে পদে ওঁৎ পেতে বসে ছিল।

মাত্র দু'মাস সময় পেয়েছিলেন। এ-স্বল্প সময়ে তিনি আন্দালুসে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া সেনাদেরকে একত্র করেছিলেন। পুরো দেশকে পুনর্গঠন করেছিলেন।

দুইমাস পর, আনবাসাহ বিন সুহাইমকে আন্দালুসের গভর্নর করে পাঠানো হয়। আনবাসাহও ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য সেনাপতি। আবার নতুন করে অভিযান শুরু হয়। তিনি যেতে যেতে প্যারিসের ৩০ কিলোমিটার দূরত্বে পৌঁছে যান। অর্থাৎ ফ্রান্সের ৭০% এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে চলে আসে। ৭২৫ সালে আনবাসাহও শহীদ হয়ে গেলেন।

তারপরে পাঁচবছরে ছয়জন গভর্নর রদবদল হয়। পুরো দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ জিহাদবিমুখ হয়ে যায়। আরব ও বারবার গোত্রগুলো পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়।

দিমাশকে খলীফা হলে হিশাম বিন আবদুল মালিক। ৭২৩-৭৪২। তিনি আন্দালুসের অবস্থা দেখে, যাচাই-বাছাই করে, আবদুর রাহমানকে পুনরায় গভর্নর হিশেবে নিয়োগ দেন।

তার মধ্যে দু'টো গুণের চমৎকার সমাবেশ ঘটেছিল:

ক: দৃঢ়তা।

খ: দয়া।

দু'টো গুণকেই তিনি চমৎকারভাবে প্রয়োগ করতে পারতেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। ছিলেন সংস্কৃতমন। কর্ডোভার বহু স্থাপনা তার হাতেই নির্মিত হয়। বিখ্যাত কর্ডোভা-সেতুও তার হাতে নির্মিত হয়। আজো সেটা জনসাধারণের পরাপারে ব্যবহৃত হয়। সেতু নির্মাণের

কাজটা কারো কারো মতে সামাহ বিন মালিকেরও বলে থাকে।

দায়িত্বভার পাওয়ার পর, প্রথম কিছুদিন গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-বিবাদ মেটানোর পেছনে সময় ব্যয় করেন। একটানা দুই বছর প্রস্তুতি নেন। তারপর বিশাল বাহিনী নিয়ে রওয়ানা দেন ফ্রান্স সীমান্তের দিকে। আগের দখল করা এলাকা পুনর্দখল করেন। আবার পিরেনিজ পর্বতমালা পার হয়ে, প্যারিসের ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্বে পৌছেন।

আবদুর রাহমান সব সময় একটা কথাই মনে রাখতেন। সেটাই তাকে এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে প্রেরণা যুগিয়েছে। কথাটা তৃতীয় খলীফা উসমান রা.-এর:

-কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে আন্দালুসের পথ ধরে। আন্দালুস বিজিত হলে, কনস্টান্টিনোপলও বিজিত হবে।

তাই আবদুর রাহমান চাচ্ছিলেন এদিকে যতোটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়া যায়।

---

বালাতুশ শুহাদা:

আমরা আজ অতি সংক্ষেপে কাজ সারবো। ইনশাআল্লাহ পরে বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ লেখা আসবে। আবদুর রাহমানকে এগিয়ে আসতে দেখে, ফ্রান্স উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়লো। পোপও তৎপর হয়ে উঠলো। সেনাপতি শার্ল মার্টেলকে দায়িত্ব দেয়া হলো। দুই দল মুখোমুখি হলো 'টুরস'এর ময়দানে।

যুদ্ধ চললো একটানা ছয়-সাতদিন যুদ্ধ চললো। কোনও পক্ষই একক সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। অষ্টম বা নবম দিনে একটা ঘটনা ঘটলো। কিছু খ্রিস্টান অশ্বারোহী উল্টো দিক থেকে মুসলিম তাঁবুতে অতর্কিতে হামলা করলো। বারবার সৈন্যরা সাথে করে স্ত্রী-পুত্রও নিয়ে যেতো। তারা এ-হামলার সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়লো।

তারা তাঁবু বাঁচাতে, পরিবার বাঁচাতে ছুটলো। মুসলিম বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সেনাপতি গাফেকী অনেক চেষ্টা করলেন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সফল হলেন না। তিনি এর মধ্যেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বীর বিক্রমে। হঠাৎ একটা তীর এসে তার গায়ে বিঁধলো। তিনি ময়দানেই শহীদ হয়ে গেলেন।

এবার মুসলিমের পুরোপুরি দিশেহারা হয়ে পড়লো। এই সুযোগে খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। রাত নেমে এলো। অসমাপ্ত অবস্থায় উভয় দল নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলো। রাতের বেলা মুসলমানরা নিরাপদ স্থানে সরে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

এ-যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণে, সামনে ইউরোপের দিকে আগে বাড়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী প্রতাপশালী উমাইয়া শাসকরাও কেন যেন সেদিকে আর পা বাড়াননি।

-----  
ফরাসী কুকীর্তি:

এক: আন্দালুসে প্রথম অভিযান পরিচালনাকারী হলো ফরাসী সম্রাট শার্লাম্যান।

-  
দুই: বার্সেলোনাকে মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো ফরাসীরা।

-  
তিন: ষষ্ঠ আলফেঞ্চে টলেডো দখল করেছিল। তাকে সাহায্য করেছিল ফরাসীরা।

-  
চার: টলেডো শহর দখল করলো ষষ্ঠ আলফেঞ্চে। শহর হস্তান্তর করার সময় একটা শর্ত ছিল, শহরের বড় মসজিদটা চিরকাল মসজিদ হিসেবে থেকে যাবে। সেখানে মুসলমানরা স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে পারবে। দুই মাস পরে আলফেঞ্চে বিশপ বারনারকে শহরের ধর্মীয় দায়িত্ব দেয়। বিশপ মসজিদকে গীজায় রূপান্তরিত করেছিল। সে ছিল ফরাসী। ১০৮৫ সালে মসজিদ গীজায় রূপান্তরিত হয়।

১২২৬ সালে তৃতীয় ফার্ডিন্যান্ড মসজিদটিকে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দিতে বলে। পরে সেখানে নির্মাণ করা হয় গথিক গীর্জা। ১৪৯৩ সালে আবার সংস্কার করা হয়।

আর টলেডো শহর দখলে আলফেঞ্চে ফরাসী সৈন্যরাও সাহায্য করেছিল। পরে মুরাবিতদের বিরুদ্ধেও তাকে ফরাসীরা সাহায্য করেছিল।

ইউসুফ বিন তাশাফীনের বিরুদ্ধে যাল্লাকার যুদ্ধেও তাকে ফরাসীরা সাহায্য করেছিল।

-  
পাঁচ: আরাগন রাজ্য মুসলমানদের থেকে সারাকুস্তা শহর দখল করে নিয়েছিল। তখন খ্রিস্টান আরাগনকে সাহায্য করেছিল ফরাসীরা।

-  
ছয়: তুরতুশা শহর দখলেও ফরাসীদের সহযোগিতা ছিল।

-  
সাত: উকাব যুদ্ধে অষ্টম আলফেঞ্চে ৫০ হাজার সৈন্য দিয়ে ফরাসীরা সাহায্য করেছিল।

-  
আট: বিভিন্ন ক্রুশেড হামলা বের হয়েছিল ফ্রান্সের ক্লেরমন্ট শহর থেকে।

-  
নয়: আরবরা ইউরোপীয় খ্রিস্টানদেরকে ‘ফারানজা’ বলতো। এখনো বলে। কারণ, ক্রুশেড যুদ্ধে আগত বেশির ভাগ যোদ্ধাই ছিল ফরাসী।

-  
দশ: আরনল্ড যে হজযাত্রীদেরকে উত্যক্ত করতো। ধরে ধরে হত্যা করতো, নবিজী (সা.)কে অশালীন ভাষায় গালি দিতো। এ নরাধম ছিল ফরাসী। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ. তাকে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন।

-  
এগার: বর্তমানের স্পেনে রাজা চার্লস। তার মূলও ফরাসী। মনসুরার যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল ফরাসী

সম্রাট নবম লুইস। রাজা চার্লস তারই বংশধর।

বারো: মিসরের মনসুরার যুদ্ধে নবম লুইস বন্দী হয়েছিল। তার সাথে একজন ঐতিহাসিকও বন্দী হয়েছিল। তার নাম গুয়ানফেল। সে লিখেছে:

-সম্রাট যুদ্ধে পরাজয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছিল। শেষে কয়েকটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল :  
ক: সামরিক ক্রুশেডের পাশাপাশি 'শান্তিময় ক্রুশেডও চালাতে হবে। দুটোর লক্ষ্য হবে এক, কিন্তু অস্ত্র হবে ভিন্ন।

খ: পাশ্চাত্যের ধর্মপ্রচারকদেরকে ব্যবহার করতে হবে। তারাই শান্তি ক্রুশেডে নেতৃত্ব দিবে। তারা ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তার অগ্রগতি ঠেকাবে। তাদেরকে আত্মিকভাবে নিঃসাড় করবে।

গ: পাশ্চাত্যের লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রাচ্যের খ্রিস্টানদেরকে ব্যবহার করতে হবে।

ঘ: প্রাচ্যের ভেতরেই পাশ্চাত্যের জন্যে ঘাঁটি তৈরী করতে হবে।

কারণ মুসলমানদের সাথে শুধু যুদ্ধ করে পেরে ওঠা যাবে না। তাদের ধর্মে এক প্রচন্ড প্রতিরোধ শক্তি আছে। তারা এ শক্তিবলে বলীয়ান হয়ে জিহাদ করে। আত্মত্যাগ করে। সম্মান ও নিজেদের ভূমি রক্ষা করে।

তাদের মধ্যে এ-চেতনা থাকলে, হারানো মুশকিল। তাদের এই আত্মিক শক্তিকে নষ্ট করে দিতে হবে। বিকৃত করে দিতে হবে।

তেরো: সম্রাট নেপোলিয়ন মিসরে প্রবেশ করে জামে আযহারের মসজিদে ঘোড়াসহ ঢুকেছিল। মসজিদকে অপবিত্র করেছিল। কুরআন কারীমের বড় বেশি অবমাননা করেছিল। মসজিদের পেশাব-পায়খানা পর্যন্ত করেছিল। ছাত্রদের কিতাবপত্র-সামান সব তছনছ করে ফেলা হয়েছিল। জামে আযহারকে মদ্যপানের আখড়া বানিয়েছিল। তিন বছরে মিসরের এক তৃতীয়াংশ জগগনকে শহীদ করেছিল। শায়খুল আযহার শারকাবী-কে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল।

চৌদ্দ: ফ্রান্স আলজেরিয়াতে ১০ মিলিয়ন মুসলমানদেরকে শহীদ করেছিল।

পনের: ফরাসি পত্রিকা শার্লি এবদো। নবিজী (সা.)কে ব্যঙ্গ করে কার্টুট ছাপিয়েছিল। প্রতিবাদ করার পর, তারা দম্ভভরে ঘোষণা দিয়ে আরও ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফরাসি সরকার ও জগগন এটাকে স্বাগত জানিয়েছিল।

ষোল: ফরাসীরা গণহত্যা চালিয়েছিল লিবিয়ায়। সিরিয়ায়। তিউনিসিয়ায়। আফ্রিকার অনেক দেশে। বর্তমানে মালিতে। ইরাকে। সিরিয়াতে। এখনো প্রতিদিন হত্যা করছে।

সতের: ফ্রান্সের আনফালিদ (আরবী উচ্চারণ) জাদুঘরে দুইটা মাথার খুলি উপর-নীচ করে রাখা হয়েছে। উপরেরটার নাম জেনারেল ক্লেয়ার। তাকে হত্যা করা হয়েছিল মিসরো। লক্ষ্য ছিল নেপোলিয়ন। ভুলে ক্লেয়ার মরেছে। মুজাহিদের নাম সুলাইমান হালাবী। মিসরবাসীর প্রতি অপমান সহ্য হয়নি তার। প্রতিশোধ নিতেই এটা করেছিলেন। তার ডানহাতকে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। তারপর সূচালো দন্ডেরও ওপর রেখে শহীদ করা হয়েছে। সে জাদুঘরে নিচের তাকে রাখা খুলিটা এ মহান মুজাহিদের। পাশে নেমপ্লেটে লেখা: কুখ্যাত খুনি সুলাইমান হালাবী।

আঠার: ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল অর্ধশতাব্দীরও বেশি মুসলমানদের শাসনে ছিল। ফ্রান্সের ‘রন’ নদীর তীর এক সময় মুসলিম মুজাহিদদের পদভারে প্রকম্পিত থাকতো।

উনিশ: ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে, আলজেরিয়ার আওরাস অঞ্চলে ‘কুরআনি মাদরাসা’গুলো এক সরকারী ঘোষণায় বন্ধ করে দেয়। প্রায় ৮ লাখ শিশুকে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার গভীর ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছিল।

বিশ: ১৯৫২ সালে ফরাসি পররাষ্ট্র দফতরের এক কর্মী বলেছিল:

-সমাজতন্ত্র পাশ্চাত্যের জন্যে কোনও হুমকি নয়। ইসলাম ও মুসলমানরাই প্রকৃত হুমকি। তারা স্বতন্ত্র একটা সভ্যতার দাবীদার। আমাদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের রয়েছে আলাদা ঐতিহ্য। মৌলিক ও যৌক্তিক। তারা নিজেরাই স্বতন্ত্র বিশ্ব গঠন করতে সক্ষম। নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেই তারা এটা পারবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিন্দুমাত্র সাহায্য না নিয়েই। আর তারা যখন শিল্প-উৎপাদনে স্বতন্ত্র হয়ে পড়বে, তাদের ঐতিহ্যটাকে তারা অন্যদিকে ছড়িয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠবে। বিলুপ্ত করে দিবে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত। সেটাকে ছুঁড়ে ফেলবে ইতিহাসের জাদুঘরে।

একুশ: ২০১৩ সালের কথা। মধ্য আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসো বুযিযি ফ্রান্সের কাছে সাহায্যের আবেদন করলো। বিদ্রোহীরা তার রাজধানী দখল করে নিচ্ছে। ফ্রান্স ২৫০ সৈন্য পাঠাল। শুধু বিমানবন্দর রক্ষা করার জন্যে। কারণ ওখানে ফরাসী স্বার্থ জড়িত।

ঠিক একই দিন জানুয়ারির ১১ তারিখ ২০১৩ সালে, ফ্রান্স মালিতে ২৫০০ সৈন্য পাঠিয়েছিল। কারণ সেখানে ইসলামি দল ক্ষমতা দখল করতে এগিয়ে আসছে।

এখন প্রশ্ন হলো: দুটি রাষ্ট্রই ফ্রান্সের সাবেক উপনিবেশ। দুই দেশের খনিজ সম্পদও সমান। কিন্তু দুই নীতি কেন?

বাইশ: ১৯৬৭ সালে ইহুদি সৈন্যরা কুদসে অনুপ্রবেশ করে। প্যারিসে বসবাসরত ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আনন্দ মিছিল বের করেছিল। তাদের হাতে ছিল ইসরাইলের জন্যে দানবাক্স। ওপরে লেখা ছিল:

-মুসলমানদেরকে হত্যা করো।

মাত্র চারদিনে চাঁদা উঠেছিল এক হাজার মিলিয়ন ফ্রাংক।



ইসরাইল থেকেও কার্ড ছাপানো হয়েছিল। লেখা ছিল ‘চাঁদের পরাজয়’। এসব কার্ড বিক্রির জন্যে পাঠানো হয়েছিল ফ্রান্সে। সংগৃহীত হয়েছিল আরও মিলিয়ন মিলিয়ন ফ্রাংক।

তেইশ: ১৭ অক্টোবর, ১৯৬১ সাল। প্যারিসে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের হলো। আলজেরিয়ান অভিবাসী মুসলমানরা ছিল উদ্যোক্তা। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে। ৩০০রও বেশি মুসলিমকে সেদিন শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। আর অগণিত আহতকে জীবিত অবস্থায় সীন নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিল। নদীর পানি লাল হয়ে গিয়েছিল। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ভেসে ওঠা লাশ দেখা গিয়েছিল।

চব্বিশ: ১৯২৯ সাল। এক ফরাসি পত্রিকা একটা অঙ্কিত কাল্পনিক ছবি ছাপলো। তাতে দেখানো হয়েছে, ফিলাস্টীনে একদল মুসলমান ইহুদিদেরকে তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করছে। অথচ তখন এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি।

পঁচিশ: ১৮১৮ সালে দাই হাসান পাশা আলজেরিয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি খুবই যোগ্য লোক ছিলেন। যে কোনও উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হতো।

২৯ এপ্রিল, ১৮২৭ সালে, ঈদুল ফিতরের দিন। সবাই এসেছে। ফরাসি দূতও উপস্থিত। এক পর্যায়ে ফরাসি দূতের কথাগুলো অপমানজনক মনে হলো পাশার কাছে। তিনি ফরাসী দূতকে দরবার ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বললেন। দূর বৈঠক থেকে নড়লো না। পাশা তাকে রুমাল উঁচিয়ে চূড়ান্ত হুমকি দিলো।

দূর সেখান থেকে বের হয়ে, বানিয়ে-ফেনিয়ে দেশে দেশে একটা চরমপত্র লিখলো। চিঠির সূত্র ধরে ফরাসী সৈন্য এসে আলজেরিয়া দখল করে নিল। ১৩০ বছর সে দখল স্থায়ী হয়েছিল।

ছাব্বিশ: নেপোলিয়ন মিসরে আসার পর মিসরবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন অসংখ্য আলিম-ওলামা ও নেতাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। বড় বড় ব্যক্তিদেরকেও অত্যন্ত অপমানজনকভাবে হত্যা করা হয়। সে বিদ্রোহ দমনে ২৫০০-রও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়।

নেপোলিয়ন এক চিঠিতে ফরাসী দার্শনিক ‘রেনে’-কে গর্বভরে লিখেছিল:

-প্রতি রাতেই ৩০ জন নেতার শিরোচ্ছেদ করি। আশা করি তাদের উচিত শিক্ষা হবে।

সাতাশ: ১৭৯৮ সালে মিসরীরা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অক্টোবরে। ফরাসী সেনার যতভাবে নিরীহ মানুষকে দমন করা সম্ভব, সব পন্থা অবলম্বন করলো।

অসহায় মানুষগুলো জামে আযহাবে আশ্রয় নিলো। নেপোলিয়ন আদেশ দিলো, দুর্গের ওপর কামান রেখে, জামে আযহার উড়িয়ে দিতে। ভেতরে যারা আছে তাদেরকে হত্যা করতে।

কামানের আঘাতে শুধু আযহার নয়, আশেপাশের ঘরগুলোও নষ্ট হয়ে গেলো। নেপোলিয়ন জানতো, মিসরীরা আযহারকে সম্মানের চোখে দেখে। সে সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিলে, তাদের মনোবল ভেঙে যাবে। আর আন্দোলনের নেতাগুলো আযহার থেকেই বের হয়।

আঠাশ: ক্রুশেড হামলা শুরু হয়েছিল ১০৯৬ সালে। শেষ হয়েছে ১২৭০ সালে। প্রথম ক্রুশেড পরিচালনা করেছিল বুতরুস। সে ছিল এক মিথ্যাবাদী ফরাসী। চরমভাবে পরাজিত হয়েছিল। শেষ দুই ক্রুশেডও চালিয়েছিল নবম লুইস। প্রথমটোতে বন্দী হয়েছিল মিসরে। পরে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেয়েছিল।

পরে আবার ১২৭০ সালে ক্রুশেডে এসেছিল। আক্রমণ করেছিল তিউনিসিয়ায়। সেটা দখল করা সহজ বিধায়। কিরতাজ এলাকার বীরসা নামক পাহাড়ের কাছে সে এবং তার সৈন্যরা মহামারীতে আক্রান্ত হয়। সবাই মারা পড়ে। লুইসকে পুড়িয়ে দেয়া হয়। তখনকার রীতি অনুযায়ী।

১৮৮১ সালে যখন ফরাসীরা তিউনিসিয়া দখল করতে এল, তখন তারা বীরসা পাহাড়ে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করলো।

ফরাসীর তাদের ক্রুশেডীয় চিন্তা নিয়েই লিগ্ট ছিল। ১৯৩০ সালে তারা ক্রুশ উঁচিয়ে ঘোষণা তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে অভিযান চালাবে!

উনত্রিশ: ১৯৩০ সালে ফরাসীরা তাদের আলজেরিয়া দখলের একশ বছর পূর্তি উৎসব পালন করে। সেখানে ফরাসি প্রেসিডেন্ট গুস্তাভ দুমার্গ বলেছিল:

-এসব অনুষ্ঠান উদযাপনের মূল রহস্য হলো, আলজেরিয়াতে ইসলামের জানাযার আয়োজন করা।

ত্রিশ: ১৯৪৫ সালে মিত্র বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে। আলজেরিয়ার অধিবাসীরাও এর আনন্দে বিজয়মিছিল বের করে। পাশাপাশি তারাও স্বাধীনতার স্লোগান দেয়। ফরাসীরা বিষয়টাকে গুরুতরভাবে গ্রহণ করলো।

তারা সাথে সাথে ভারী অস্ত্র, কামান, ট্যাংক, সজোঁয়া যান, বিমান নিয়ে মিছিলের ওপর হামলা করলো। ফ্রান্স দাবী করলো: তিনশ লোক নিহত হয়েছে।

একদিন পর অবস্থা বেগতিক দেখে স্বীকার করতে বাধ্য হলো: ১০০০ লোক নিহত।

একমাস পর স্বীকার করলো: দুই হাজার লোক নিহত।

বিশ বছর পর ফ্রান্স স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে: ৪৫ হাজার নিরপরাধ মানুষকে তারা হত্যা করেছে।

কিন্তু আলজেরিয়ার স্থানীয় পরিসংখ্যান হিসেব করে বের করেছে: নিহতের সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

একত্রিশ: আলজেরিয়ায় নারীদের সবচেয়ে নিম্নতম শাস্তি ছিল: ট্রাকের পেছনে রশি দিয়ে বেঁধে, অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া।

বত্রিশ: ফরাসীরা মরক্কোতে, মুসলমানদের হত্যা করে রাস্তার পাশে লাশ বা কণ্ডিত খুলি ঝুলিয়ে রাখতো। একেকটা শাল-খুলি চল্লিশ বছর থাকার নজিরও আছে।

তেত্রিশ: ১৯১৭ সাল। ফ্রান্স আফ্রিকার চাদে আক্রমণ করেছে। এক পর্যায়ে ৪০০ আলিমকে জড়ো করলো। সবার মাথা গিলোটিকে কেটে ফেলা হয়েছিল।

চৌত্রিশ: ১৮৫২ সালে ফ্রান্স আলজেরিয়ার আগওয়াত শহরে প্রবেশ করেছিল। একরাতেই তারা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল শহরের দুই তৃতীয়াংশ মানুষকে।

পঁয়ত্রিশ: ১৯৬০ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স সর্বমোট ১৭ বার আণবিক বোমা পরীক্ষা করেছে আলজেরিয়াতে। এর রাসায়নিক তেজক্রিয়ায় নিহতের সংখ্যা ফ্রান্স কখনোই প্রকাশ করেনি। ধারণা করা হয় ২৭ হাজার হতে পারে। কারো কারো মতে একলাখের কম নয়।

ছত্রিশ: ফ্রান্স ১৯৬২ সালে আলজেরিয়া ছাড়তে বাধ্য হয়। আসার আগে তারা সেখানে অসংখ্য মাইন পুঁতে রেখে আসে। বলা হয়, মাইনের প্রকৃত সংখ্য মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। প্রায় ১১ মিলিয়ন মাইন। বিষয়টা অবিশ্বাস্য মনে হলেও, সত্যি। ফরাসিরা স্রেফ জানোয়ার।

সাতত্রিশ: ফ্রান্স আলজেরিয়াতে ছিল ১৩২ বছর। প্রথম সাত বছরেই তারা শহীদ করেছিল এক মিলিয়ন মুসলমান। শেষ সাত বছরে শহীদ করেছিল দেড় মিলিয়ন।

আটত্রিশ: ফ্রান্স তিউনিসিয়াতে ছিল ৭৫ বছর। মরক্কোতে ছিল ৪৪ বছর। মৌরিতানিয়ায় ছিল ৬০ বছর। সেনেগালে ছিল তিনশ বছর।

-----  
-----

ফ্রান্স সিরিয়া ও ইরাকে নৃশংস বিমান হামলা চালিয়ে আসছে। তাদের এ -হামলার খরচ যোগাচ্ছে ফরাসী জনগন। হামলায় সহায়তা করছে তাদের ট্যাক্স। তাদের ভ্যাট। তাদের ভোট। হত্যা করা ও হত্যায় সহযোগিতা করা সমান অপরাধ। ফ্রান্সে তো মুসলমানরা আছে, তারাওতো ভ্যাট-ভোট দেয়। তবে?

= আর হ্যাঁ, আমরা নিরপরাধ মানুষের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই। মাযলুম ও মাযলুমের পক্ষের মহান মানুষগুলোর জন্যে রইলো আমাদের অন্তরিক দু 'আ। রাক্বে কারীম তাদেরকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

--

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কথা থেকে গেল। পাশ্চাত্যের নাগরিকদের প্রকারভেদ নিয়ে। কাফিরদের দুযোগে আনন্দ বা শোক প্রকাশ নিয়ে! পরে ইনশাআল্লাহ।

--  
--

জে সুইস আবদুর রাহমান গাফেকী।  
আমরা সবাই আবদুর রাহমান গাফেকী।

রাহিমাহ্লাম্ তা'আলা।

একটা আয়াত পড়েই শেষ করি?

ومن يتولهم منكم فانه منهم

আর যে তাদের (কুফযারের) সাথে একাত্মতা পোষণ করবে, তাহলে সে অবশ্যই তাদের দলভূক্ত বলে গণ্য হবে?

= তাহলে শোক, ছিঁচকাঁছনি, প্রোফাইল পিক?

alammin5g

## হারিয়ে যাওয়া জান্নাত : বীরদের আখ্যান

বাহাদুরির প্রতিদান :

হিজরি সপ্তম শতাব্দী মোতাবেক ত্রৌদশ খ্রিষ্টাব্দের কথা। খাওয়ারিজম শাহিদের প্রতাপ তখন মধ্যগগনে। ইরান, ইরাক, খোরাসান এবং শাম কজা শেষে পুরো মধ্য-এশিয়ার মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসার পথে। অতুল ক্ষমতা বলে তারা যখন এ ইচ্ছে বাস্তবায়নের একেবারে দ্বারপ্রান্তে, ঠিক সে মুহূর্তে শুরু হয়ে যায় তাতারি ফেতনা। চেঙ্গিস খান তার হিংস্র বর্বরতা নিয়ে আছড়ে পড়ে উজাড় করে ফেলে বিশাল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য। যদিও খাওয়ারিজমি তুর্করা বীরত্বের দিক দিয়ে একেবারে সাধারণমানের ছিল না, তথাপি তাদের পক্ষে চেঙ্গিসি ঝড়ের মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। ধ্বংসের সে তাণ্ডবে লগুভগু হয়ে পড়া খাওয়ারিজমিরা বাঁচার তাগিদে হয়ে যায় একেবারে ছত্রছাড়া।

খাওয়ারিজমিরা বংশগতভাবে ছিল তুর্ক। এমনি এক তুর্ক গোত্রের সরদার উরতুগরুল জন্মভূমি ছেড়ে আশ্রয়ের আশায় হিজরত করছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন সালজুকির রাজধানী কোনিয়ার দিকে। সাথে ছিল গোত্রের প্রায় ৪০০ পরিবারের ছোটখাটো একটা দল। আঙ্গুরার পাশে পৌঁছতেই এক অস্বাভাবিক ঘটনার মুখোমুখি হয়ে সেখানেই থামিয়ে দেন কাফেলা। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেন দুটি বাহিনী পরস্পর লড়াই করছে। একটি বাহিনী দুর্বলতার দরুন পরাজয়ের মুখোমুখি; আর সবল বাহিনী ক্রমশ চেপে ধরছে দুর্বল বাহিনীটিকে।

আজন্ম যোদ্ধাজাতির নেতা উরতুগরুলের পক্ষে দৃশ্যটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি মনে মনে দুর্বল দলটিকে সহায়তাদানের স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন এবং প্রায় সাথে সাথে গোত্রের সশস্ত্র যুবকদের নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর বাহিনীতে ছিল মাত্র ৪৪০ জন জওয়ান। ওরা ছিল বিভিন্ন মাঠের পোড়খাওয়া সৈনিক। কালের আবর্তে পড়ে যদিও আজ ওরা আশ্রয়ের খোঁজে; কিন্তু ওদের প্রত্যেকের ধমনীতে বইছিল দিগ্বিজয়ীদের রক্ত। ওরা বিপক্ষ শক্তির উপর এমন টর্নেডো হয়ে আছড়ে পড়ে যে, খানিক পরেই সম্পূর্ণরূপে পালটে যায় যুদ্ধের পট। একসময় যারা ছিল বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এখন তারাই জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে পলায়নপর। লড়াই সমাপ্তির পর উরতুগরুল জানতে পারেন; যাদের তারা সহযোগিতা দিয়েছেন, তারা হচ্ছেন সুলতান আলাউদ্দিন সালজুকির বাহিনী। পরাজিত হয়ে যারা পালিয়ে যাচ্ছিল, তারা হচ্ছে তাদের অস্তিত্বের শত্রু তাতার বাহিনী। সরদার উরতুগরুল মহানুভবতা দেখিয়ে পরিচয় না-জানার পরও যে অসামান্য সহায়তা দেন, এর কৃতজ্ঞতায় আলাউদ্দিন আঙ্গুরার পাশে তাদেরকে বিশাল ভূসম্পত্তির জায়গির দান করে বসবাসের সুযোগ করে দেন। সে উর্বর ভূখণ্ডটি বর্তমান ইস্তাম্বুলের একেবারে নিকটেই। ভূখণ্ডটি ছিল রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তের পাশে; এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গমস্থলে।

অভিজাত সর্দার :

সুলতান আলাউদ্দিন কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সরদার উরতুগরুলকে যে ভূখণ্ড দান করেছিলেন সেখানে বসবাস করতে গিয়ে তাঁকে কিছু সময়ের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, পাশেই ছিল রোমান বাইজেন্টাইনদের উপস্থিতি। ফলে প্রায়ই তাদেরকে ইউরোপের বিভিন্ন দুর্গ অধিপতিদের সাথে লড়াই করতে হতো। তবে এটা প্রবীণ তুর্ক সরদারের জন্য উটকো কোনো ঝামেলা মনে হয়নি; বরং এটা তাঁর জিহাদি জজবাকে আরও জাগিয়ে তুলে। তিনি স্বভাবজাত বীরত্ব প্রদর্শন করে অল্প কিছুদিনের ভেতরেই খ্রিষ্টানদের মধ্যে এমন ভ্রাসের জন্ম দেন যে, তারা এদিকে আর উঁকি দেওয়ারও সাহস রাখেনি। তাঁর একের পর এক বিজয়ের ফলে তাদের অন্তরে মারাত্মক ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে উরতুগরুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে আরও অনেক তুর্ক গোত্র তাঁর পতাকাতলে এসে তাঁর হাতকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

একবার তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানরা তাতার এবং ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের যৌথবাহিনীকে কুকুরতাড়া করেন। এটা ছিল ওই এলাকার জন্য একটা স্মরণীয় ঘটনা। উরতুগরুলের এ মহান কর্মযজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে মুগ্ধ সুলতান তাঁকে আরও বিপুল জায়গির প্রদানের পাশাপাশি নিজ সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের সেনাপতি বানিয়ে নেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের পতাকা ছিল চন্দ্রখচিত। উরতুগরুল সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে ওই প্রতীক ব্যবহার করতেন। আজ অবধি তুর্কিদের কাছে এ প্রতীকটা তাদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

৯৮৭ হিজরি মোতাবেক ১২৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ৯০ বছর বয়সে উরতুগরুল মারা যাবার পর ৩০ বছর বয়সী তাঁর বড় ছেলে গাজি উসমান খান গোত্রের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তিনিই ছিলেন উসমানি খেলাফতের ভিত রচনাকারী ও প্রথম মুকুটধারী। ছিলেন বিস্ময়কর কিছু গুণের অধিকারী। সরলতা, বীরত্ব, দীনদারি ও খোদাভীরুতায় ছিলেন ইসলামের সোনালাি যুগের শাসকদের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

সুলতান আলাউদ্দিন সালজুক সাম্রাজ্যের জন্য উসমান খানের ত্যাগ ও সেবায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় উপাধি প্রদানের পাশাপাশি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন এবং জুমআর খুতবায় নিজের নাম উচ্চারণের অনুমতি দিয়ে দেন। সুলতানের অপরাপর আমিরগণ বিদ্রোহী হয়ে স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য গঠন করে চললেও উসমান খান সে-পথে হাঁটেননি। তিনি তাদেরকে বহুগুণ শক্তিশালী হবার পরও সুলতানের জীবৎকাল পর্যন্ত পিতার মতোই একনিষ্ঠ অনুগত থেকে যান এবং অসংখ্য বিজয়ের মাধ্যমে সুলতানের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে নিবেদিত থাকেন।

বিশ্বস্ততার পুরস্কার :

তাঁর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশেষ সেবা নেওয়া আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ; বিধায় বিশ্বস্ততার



পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তাঁকে সালজুক সাম্রাজ্যের কর্ণধার বানিয়ে দেন। কোনো প্রকার নিমকহারামি ব্যতীত এমনিতেই সাম্রাজ্য তাঁর কজায় চলে আসে।

ঘটনা হচ্ছে, ৬৯৯ হিজরি মোতাবেক ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে তাতারদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সুলতান আলাউদ্দিন এবং যুবরাজ গিয়াসুদ্দিন শাহাদত বরণ করলে নিবে যায় সালজুক সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ। তখন সালজুক তুর্কসহ অপরাপর তুর্ক গোত্রগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে উসমান খানকে কোনিয়ার রাজমসনদে আসীন করিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর হাতে শপথ গ্রহণ করে। এভাবেই সে মহান সাম্রাজ্য অস্তিত্বে আসে, যা কয়েক শতাব্দীব্যাপী ইউরোপে দাপট এবং মর্যাদার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে। যে সাম্রাজ্যের দিগ্বিজয়ীরা কুসতুনতুনিয়া জয় করে পালটে দেন ইতিহাসের মোড়। যারা হন রাসুল সা.-এর সুসংবাদ বাস্তবায়নের গৌরবের অধিকারী। যদি নিজেদের লোক তাঁদের পিঠে ছুরি না হানতো, তাহলে আজ হয়তো ইউরোপে খ্রিষ্টবাদের চিহ্নটুকুও থাকত না। এশিয়ার মতো ইউরোপও হতো মুসলিমপ্রধান মহাদেশ। খেলাফতে আব্বাসিয়া -উত্তর তাঁদের খেলাফতই বিশ্বে ইসলামের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছিল। এই খেলাফতের শাসকরা এমনসব কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন, যার উপর অনাগত ভবিষ্যতের মুসলমানরাও গর্ব করতে পারে।

গাজি উসমান খানের বংশধারায় আল্লাহ বড় বড় অনেক বিজৈতার জন্ম দিয়েছিলেন। কারণ বোধহয় এটাই যে, সুলতান ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, দানবীর এবং খোদাভীরু। তাঁর বিয়ে হয়েছিল এমন এক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গকন্যার সাথে, যে নিজে ছিল তাকওয়া এবং পবিত্রতার উঁচু অবস্থানে।

এখানে আমরা প্রথমে উসমান খানের কিছু উন্নত গুণাবলির আলোচনা করব ; অতঃপর আলোচনা করব তাঁর বিয়ের কাহিনি। আশা করি তখন উপলব্ধি করতে পারবেন, কেন আল্লাহ তাঁর সন্তানদের মাধ্যমে ইসলামের এ বিশাল খেদমত নিয়েছেন। আকা

**ব্যক্তিগত গুণাবলি :**

একজন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে যেসব গুণাবলি থাকার প্রয়োজন, উসমান খানের মধ্যে সবগুলোই ছিল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাঁর সাহস ও বীরত্ব ছিল প্রায় অতিলৌকিক। নেতৃত্বদানের যোগ্যতা ছিল সহজাত। লড়াইয়ের ময়দানে ব্যক্তিগত বীরত্ব সৈন্যদের অন্তরে জন্ম দিত দুর্জয় বিজয়াকাঙ্ক্ষার। তাঁর রাষ্ট্রনীতি তাঁকে করে তুলছিল জনগণের আপনজন। ন্যায়পরায়ণতা ছিল প্রবাদপ্রতীম। তাঁর বিচারিক আদালতে তুর্ক, তাতার, মুসলিম ও খ্রিষ্টানের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। জনগণের কল্যাণই ছিল রাষ্ট্রচিন্তার মুখ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ছিল পরম ধ্যান-জ্ঞান। প্রথমযুগের মুজাহিদদের মতো তাঁর জীবনাচার ছিল সম্পূর্ণ লৌকিকতামুক্ত ও সাধাসিধে। সম্পদ সঞ্চয় তাঁর ধাতে ছিল না। গনিমতের মালে মুজাহিদদের অংশ প্রদানের পর যা থাকত, তা গরিব-

মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। যে ঘরে বসবাস করতেন, ইনতেকালের পরে সেখানে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও তিল পরিমাণ সোনারোপা কিংবা হিরে-জহরত পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছিল মাত্র একটি সুতি-পাগড়ি, কাঠের তৈরি একটা চামচ আর একটি লবণদানি। উত্তরাধিকার সম্পদের মধ্যে রেখে যান কয়েকটা আরবি ঘোড়া, কৃষিকাজের জন্য কয়েক জোড়া ষাঁড় এবং একপাল ভেড়া। এ ছাড়া ছিল কয়েকটি পতাকা ও কিছু অস্ত্র। তিনি ছিলেন জনসাধারণের হৃদয়ের মধ্যমণি। পরবর্তীতে তাঁর বংশের যিনি উত্তরাধিকার হতেন, তার অভিষেক অনুষ্ঠানে কোমরে তাঁর এই তলোয়ার বেঁধে দেওয়া হতো এবং তাকে এ দু'আ দেওয়া হতো— আল্লাহ যেন তোমার মধ্যে উসমানের মতো কল্যাণ দান করেন।

অদৃশ্য ইশারা :

সুলতানের বিয়ের কাহিনি নিম্নরূপ : রাজধানী শহরের পাশেই ছিল আবতারুনি নামক একটা গ্রাম। সেখানে বসবাস করতেন একজন খোদাভীরু দরবেশ আলেম। যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকেই তাঁর দরবারে ছিল উসমান খানের যাতায়াত। বুজুর্গের ছিল এক কন্যা। সে ছিল সৌন্দর্য, উত্তম আচরণ এবং খোদাভীরুতায় নিজেই নিজের উদাহরণ। উসমান খান একদিন দরবেশের কাছে তাঁর মেয়ের সাথে বিয়ের আবেদন নিয়ে যান। কিন্তু সামাজিক স্ট্যাটাসের তফাৎ বিবেচনায় দরবেশ উসমানের আবেদন ফিরিয়ে দেন। উসমান ছাড়া আরও বেশ ক'জন আমিরপুত্রের পক্ষ থেকে দরবেশ বরাবরে তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব গিয়েছিল। দরবেশ তাদের প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এক রাতে উসমান খান এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেন। দেখতে পান একটা নতুন চাঁদ দরবেশের বুক থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে চতুর্দশীর চাঁদের রূপ ধারণ করে তাঁর বুকে এসে ঠাই নিচ্ছে। এরপর তার বাহু থেকে একটা বৃক্ষ গজিয়ে উঠে তা ক্রমশ মহিরুহের রূপ ধারণ করছে। একপর্যায়ে বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখা জলে-স্থলে ছেয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া সে বৃক্ষের মূল থেকে পৃথিবীর বড় চারটি নদী তথা দজলা, ফুরাত, নীল এবং দানিযুব উৎসারিত হয়ে আপন গতিতে বয়ে চলছে। অনুরূপ পৃথিবীর চারটি বড় পর্বত তথা ককেশাস, বলকান, তুর ও এটলাস এই বৃক্ষের কাণ্ডগুলোর ভার বহন করে চলছে। হঠাৎ দমকা বাতাস বইতে শুরু করলে তলোয়ার আকৃতির বৃক্ষপত্রগুলো এমন একটি শহরের দিকে উড়ে যেতে থাকে, যেটি দুই নদী ও দুই মহাদেশের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। শহরটিকে এমন একটি আংটিবৃত্তের মতো দেখাচ্ছিল, যার উপর রয়েছে দুটি করে নীলকান্তমণি ও পান্না পথর। উসমান আংটিটি হাতে পরবার জন্য হাত বাড়াতোই তাঁর ঘুম টুটে যায়। জাগ্রত হবার পর দ্রুত দরবেশের খেদমতে উপস্থিত হয়ে স্বপ্নবৃত্তান্ত খুলে বলেন। দরবেশ স্বপ্নটিকে একটা অদৃশ্য ইঙ্গিত মনে করে তাঁর মেয়েকে উসমানের হাতে তুলে দেন।

এভাবেই ঘটিত হয় সে মহান বংশের ভিত্তি, যার উত্তরপুরুষদের সাম্রাজ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তথা তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। যে বংশের বীরদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে কেঁপে উঠছিল ইউরোপের প্রতিটি রাজধানী।

বই : স্পেন টু আমেরিকা  
আবু লুবাৰা শাহ মানসুৰ  
আবদুৰ রশীদ তারাপাশী অনুদিত



## এক চুমুকে ইতিহাস: ৪১

### আতিক উল্লাহ

ইউসূফ বিন তাশাফীন (রহ.) যখন আন্দালুসে আসেন, সেখানে ছিল কবি-কবিতা, মদ-সুরার সমারোহ। আনন্দ-বিনোদন আর জাঁক-জৌলুসের ঠাট-ঠমক।

ইউসূফ বিন তাশাফীন এসেই এসব বন্ধ করেছেন। কবিদেরকে শহর ছাড়া করেছেন। নর্তকীদেরকে বোরখা দিয়ে ঢেকেছেন। পানশালা-হাম্মামগুলোতে চলে আসা পাপাচার বন্ধ করেছেন।

সবাই মুতামিদ বিন আব্বাদকে গালি দিতে শুরু করলো। এ কোন আপদ নিয়ে এল! কবিতা পছন্দ করে না! নাচ-গান জানে না! মোটা পশমের কাপড় পরে থাকে। গায়ের রঙ কালো!

ইউসূফ বিন তাশাফীন যদি একালে এমন করতেন, তাহলে প্রচারমাধ্যমের লোকেরা তার সম্পর্কে কী বলতো?

= এক কথায় খারোজী। সন্ত্রাসী। বর্বর। চরমপন্থী।

এমনকি ততকালীন আন্দালুসের বড় আলিমরা পর্যন্ত এ -মহান বীরকে বর্বর-অশিক্ষিত-ইসলামের উদারতা সম্পর্কে অজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করতে পিছপাহয়নি!

এ-যুগের আলিমরাও তাই করতো! ইসলাম শান্তির ধর্ম! উদারতার ধর্ম! ক্ষমার ধর্ম!

আরও কত কী যে বলতো!

## ফিরে ফিরে আসে এই দিন

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

আন্দালুস। কেউ বলেন মুসলিম স্পেন। হারিয়ে যাওয়া এই জান্নাত আজই (02/01/1492) হারিয়ে গিয়েছিলো।

খুব স্বাভাবিক, এই আন্দালুস নিয়েই আজ কথা বলা। কিন্তু মন বলছে—কোন্ আন্দালুস নিয়ে তুমি কথা বলবে? তোমার পাশে তো অনেক আন্দালুস! আমিও দেখলাম—আসলেই তো আমি অনেক আন্দালুসের অঞ্চ ও রক্তে ভাসছি! এ অঞ্চর কোনো শেষ নেই! মুছি আর প্লাবিত হই! শুকোয় আর সব ভেসে-ভেসে যায়!

গতকাল এক বন্ধু আন্দালুস নিয়ে লেখা চাইলেন। তিনি পোর্টালে ছাড়বেন। পৃথিবীকে জানাবেন নতুন করে—আমাদের একটি আন্দালুস ছিলো। আমাদের একটি জান্নাত ছিলো।

ও-ও-ও হ! আর কতো! এসবের ভেতরে সান্ত্বনা খুঁজতে খুঁজতেই আমরা কাপুরুষ হয়ে বসে আছি! ২ তারিখ এলেই জানান দিই—এই যে আমি আছি—আবু আবদিল্লাহর বন্ধু!

আসলেই আমরা ওই কাপুরুষের বন্ধু!

গ্রানাডার শেষ বীরের কথা আমাদের মনে পড়ে না!

বিজয়ী তারিকের অমিত সাহসিকতাও আমাদের রক্তে ‘সুনামি’ আনে না!

বারবার শুধু ভেসে ওঠে—আবু আবদিল্লাহ!

বন্ধু, খুঁজে পাচ্ছে না আন্দালুস? ...

তাকাও—

আফগানিস্তান একটি আন্দালুস!

ইরাকে আজম একটি আন্দালুস!

শান্তি ও স্বস্তির দেশ—শামও আন্দালুস!

আলাদা করে বলবো কি—জর্দান-ফিলিস্তিনের কথা?

ইয়েমেন?

আরাকান?

পাকিস্তান?

কাশ্মির?

প্রিয় বাংলাদেশও তো হয়ে উঠছে আরেক আন্দালুস?

মিথ্যার কী জয়জয়কার!

অপশক্তির কী সাজসাজ রব!!

মায়লুমিয়াতের দ্রাহ্ধনিতে এই বুঝি বিদীর্ণ হলো আকাশ!

ইয়া রব!

মনে বল দাও!

কলমে কালি দাও!

লিখে যেতে চাই সব আন্দালুসের রক্তগাথা!

alammin5g



সৌন্দর্য মানে কী?

সৌন্দর্য মানে: আন্দালুস। আমাদের হারানো ফিরদাওস।

তারা বলে:রয়্যাল প্যালেস। ইশবীলিয়া (সেভিল)।

আমরা বলি: আক্সুল আন্দালুস। স্পেনের কনে।

ইনশাআল্লাহ আমরা আর বেশিদিন কনেহীন থাকবো না।

অামাদের বধু আমাদের ঘরেই ফিরবে। - **আতিক উল্লাহ**



ইসাবেলা! তাড়িয়ে দিয়ে ভাবছো চিরদিনের জন্যে আন্দালুস তোমাদের হয়ে গেছে ? ভুল সবই ভুল!

এই দেখ আজো আমরা নিজেদের ঘরের চাবি বয়ে বেড়াচ্ছি! বংশানুক্রমে! আমার মতো এমন অসংখ্য মানুষ, গোটা মাগরিব (মরক্কো-আলজেরিয়া) অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে! আমরা আসছি!

না না, আমাদের নেতা আবু আবদুল্লাহ (সগীর)-এর মতো ভীতু কেউ হবে না, ইউসুফ বিন তাশাফীনের মতোই কেউ হবে! ইনশাআল্লাহ!

ফার্ডিন্যান্ড! শুনতে কি পাও! অশ্বখুরের টিগটিগ টিগটিগ ধ্বনি ?

তাকবীর.....!!!

-আতিক উল্লাহ



## এক চুমুকে ইতিহাস: ২৮৩

### আতিক উল্লাহ

খেলাফতে রাশেদার যুগে আমরা জয় করেছি:

-ইরাক। শাম (সিরিয়া-ফিলাস্তীন-জর্দান ইত্যাদি)। খোরাসান। মিসর। আফ্রিকা।

-

খেলাফতে বনি উমাইয়ার যুগে আমরা জয় করেছি:

-আন্দালুস। সিন্ধু অঞ্চল। ভারত।

-

আব্বাসী খিলাফতকালে আমরা জয় করেছি:

-আমুরিয়া (বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রবেশপথ)।

-

মামলুক যুগে আমরা পরাজিত করেছি:

-মোঙ্গলদেরকে। তুর্কুশদেরকে।

-

উসমানি সালতানাতের যুগে আমরা জয় করেছি:

-কনস্টান্টিনোপল। ইউরোপ।

-

সাইকো-পিকো ও পশ্চিমাদের ক্রীড়নক শাসকদের আমলে আমরা ‘ফাতহ’ (ফতেহ অর্থ খোলা ও দেশ জয় করা) করেছি, মানে খুলেছি ‘টুনা ও সার্ডিনের’ কৌটা। মদের বোতল।

-

আমরা ফাতাহ করেছি (খুলেছি) অসংখ্য জেলখানা। বলাবাহুল্য আরব বিশ্বের জেলখানা নির্মাণের হার পুরো বিশ্বের যে কোনও দেশের চেয়ে অনেক বেশি!

-

আমরা ফাতহ করেছি: অসংখ্য শরণার্থী শিবির।

আমরা ফাতহ করেছি অসংখ্য গণকবর।

আমরা ফাতহ করেছি অসংখ্য গণিকালয়। মদের বার। নাইটক্লাব।

আমরা ফাতহ করে দিয়েছি: আমাদের নৌবন্দর ও বিমানবন্দরগুলো। পশ্চিমা যুদ্ধযানগুলোর জন্যে। তারা যেন এসব বন্দর ব্যবহার করে নিরীহ মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালাতে পারে।

...

স্পেন যখন মুসলিম শাসিত ছিল তখন স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মূল ফটকে এই বানীটি লেখা ছিলঃ

দুনিয়া চারটি স্তম্ভের উপরে দাড়িয়ে থাকে

১। আলেমদের হিকমাহ (العلم) ।

২। শাসকদের আদালত (ন্যায়বিচার)।

৩। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ইবাদত।

৪। বীরপুরুষদের বীরত্ব।

(সংগ্রহেঃ উত্তর ককেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও লেখক হায়দার বাস্মাত)

-

~

[#ইসলামের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস](#)

...

১৪৯২ সালের ২রা জানুয়ারি ...

৫২৭ বছর আগে আজকের এই দিনে আল-আন্দালুসের শেষ মুসলিম শাসিত শহর 'গ্রানাডা' মুসলমানদের হাতছাড়া হয়েছিল।

আবু আব্দুল্লাহ যখন গ্রানাডা, তাঁর বিলাসি রাজপ্রাসাদ 'আল হামরা' ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখন বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে দর দর করে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। এই অবস্থা দেখে তাঁরই বৃদ্ধা মা আয়েশা ছেলেকে ভৎসনা করে বলেছিলেন 'আবু আব্দুল্লাহ, একজন পুরুষের মত যে শহরকে রক্ষা করতে পারনি, একজন নারীর মত তার জন্য কাঁদছ কেন!'

-

-

[#ইসলামের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস](#)

[#lost islamic history dot com](https://lostislamichistory.com)

## ফিলহাল-হালচাল-সমকাল:৫২

উদযাপন!

### আতিক উল্লাহ

-

দুবাই, বাইরুত, কায়রো, আলজেরিয়া, কুয়েত, মানামা, দোহাসহ সমস্ত আরব দেশও মুসলিম দেশগুলোর রাজধানী বর্ষবরণ উৎসবের জন্যে মুখিয়ে আছে।

আতশবাজি নিয়ে অপেক্ষা করছে। কোটি কোটি ডলার অপচয় হওয়ার প্রতীক্ষায় আছে।

কিন্তু খ্রিষ্টান স্পেন ভিন্ন এক উদযাপনের জন্যে জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রতিবছরই নিয়ে থাকে। জানুয়ারির দুই তারিখে।

তারা স্পেনের মসজিদগুলোকে গীর্জায় রূপান্তরিত করার ৫২৪ বছর উদযাপন করবে।

লাখ লাখ মুসলমানকে শহীদ করে দেয়ার ৫২৪ বছর উদযাপন করবে।

আর আমরা খ্রিস্টানদের বর্ষকে স্বীকৃতি দিয়ে উদযাপন করবো : থার্টি ফাস্ট নাইট!

ওরা পরদিন উদযাপন করবে: ইসলাম এন্ড মুসলিম ক্লিনজিং ডে-নাইট!

আল-আমিন



# ইশবিলিয়া (Sevilla)

আজকে সেভিল্লা শহর নামে পরিচিত শহরটির পূর্ব নাম ছিল ইশবিলিয়া। এটি ইসলামের একটি প্রাচীন নগরী ছিল। এই শহরটি ৫০০ বছর ধরে ইসলামের শহর ছিল। এই শহরে দীর্ঘ ৫০০ শত বছর আজানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে, যে ধ্বনি দীর্ঘ ৫০০ বছর ধরে আন্দোলিত করেছিল সেখানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে। আপনারা সকলেই জানেন যে, বিখ্যাত সেনাপতি তারেক বিন জিয়াদ ৯১ হিজরি (৭১১ সালে) সর্বপ্রথম স্পেনের ভূমিতে পা রাখেন। তারিক বিন জিয়াদ স্পেনে যাওয়ার এক বছর পরে অর্থাৎ ৯২ হিজরিতে মুসা ইবনে নুসাইর ইশবিলিয়া (Sevilla) নামক শহরে আসেন এবং এই শহরকে বিজয় করেন। কিছু দিনের জন্য এই শহরটি হাত ছাড়া হয়ে গেলে মুসা বিন নুসাইর তার ছেলে আব্দুর রহমানকে সেখানে পাঠান এবং পুনরায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কয়েম করেন। সেই দিন থেকে ৫০০ বছর এই শহরটি ইসলামের শহরে রূপান্তরিত হয়। ইশবিলিয়া (Sevilla) কে বিজয় করার পর মুসলমানগণ এই শহরে তাদের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ইশবিলিয়া (Sevilla) উলু মসজিদ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আজকে এই মসজিদটিকে তারা গির্জায় রূপান্তরিত করেছে। মসজিদের মূল ফটক ভেঙ্গে ফেলেছে কিন্তু তারা মিনারকে ভেঙ্গে ফেলতে পারেনি। তবে মিনারের উপরে তারা তাদের ক্রুশকে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

ইতিহাসে এই শহরটি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে জ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির কোন কার্যক্রম না থাকলেও সিভেল্লা এখনো স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। কিন্তু ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে এই শহরটি নিজেকে নিয়ে গিয়েছিল এক অনন্য উচ্চতায়। প্রখ্যাত আলেম আবুল খাইর এই শহরের, বোটানীর (উদ্ভিদবিদ্যার) ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী ইবনে আওয়ামও এই শহরের। প্রখ্যাত আলেম আবু বকর ইবনে আরাবীও ছিলেন এই শহরের। এই সকল বিশ্ববিখ্যাত আলেম ছাড়াও আমরা যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এই শহরে কত বড় বড় আলেম জন্মগ্রহণ করেছেন।

তবে আরেকটি বিষয় এখানে প্রনিধানযোগ্য, ১১ শতাব্দীতে এই শহরে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ কার্যক্রম শুরু হয়। তখনও মুসলমানদের মধ্যে খুব বেশী সমস্যা তৈরি হয়নি। কিন্তু এই অনুবাদের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্রে বিভ্রান্তি ঘটায়। মুসলমানদের লেখা গ্রন্থগুলোকে তাদের নিজেদের নামে চালিয়ে দেওয়া শুরু করে। এটা নিয়ে অনেক বেশী গবেষণা হওয়া দরকার।

এই অঞ্চলে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, মিউজিক, কৃষিসহ সকল ক্ষেত্রে এত উচ্চতায়

পৌঁছেছিল যে, মুসলমানগণ যদি ইতিহাস থেকে ছিটকে না পড়ত তাহলে সমগ্র পৃথিবী হয়তবা আজ অন্য একটি অবস্থানে থাকত। আমরা সকলেই জানি যে, যখন কোন আদর্শ সফলতার চূড়ায় আরোহিত হয় তখন মানুষ সে আদর্শ বা সভ্যতাকে অনুকরণ করে থাকে। আজকে যেমন মুসলমানরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করে। তাদের ভাষায় কথা বলে, তাদের মত করে পোশাক পরে, তাদের শহরের আলোকে নিজেদের শহরকে গড়ে তুলে। তেমনি ভাবে ঐসময়ে এই সেভিল্লা ও আন্দালুসিয়াও এমন এক অবস্থানে ছিল যে, পাশ্চাত্যে বসবাসকারী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা মুসলমানদেরকে অনুসরণ ও অনুকরণ করত। তারা মুসলমানদের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করত, তাদের পোশাক পরিধান করত, তাদের শহরের অনুকরণে নিজেদের শহর ও ঘরবাড়ি বানাত। এটা দেখে তৎকালীন পোপরা এক মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। তাই তারা তাদের যুবসমাজকে মুসলমানদের আদর্শ থেকে রক্ষা করার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা বলেন, আমাদের যুবকরা মুসলমানদের অনুসরণ ও অনুকরণ করছে, তাদের ধর্মকে গ্রহণ করছে তাই আমাদেরকে এদেরকে রক্ষা করার জন্য কাজ করতে হবে।

মুসলমানগণও তাদের উচ্চতাকে ধরে রেখে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে এবং জ্ঞানকে অন্যদের সাথে ভাগাভাগি বা শেয়ার করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি।

চারটি প্রতিষ্ঠানকে মুসলমানগণ বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোক্ত করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মুসলমানগণ বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করেননি।

এগুলো হল,

- ১। হাসপাতাল, আমরাই মানুষকে হাসপাতাল শিক্ষা দিয়েছি।
- ২। বিশ্ববিদ্যালয়, আমরাই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করে এর সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।
- ৩। পর্যবেক্ষণকেন্দ্র (Observatory) এর সাথে মানুষকে আমরাই সর্বপ্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।
- ৪। উন্নত খাদ্য।

শুধু এগুলোই নয়, ইউরোপের খাবারের ক্ষেত্রেও আমাদের ভূমিকা অনেক বেশী। আমরা ইউরোপকে তাদের খাবার-দাবারকে উন্নত করার জন্য অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছি। যেমন চিনি। সর্বপ্রথম চিনি আবিষ্কার করে মুসলমানগণ। চিনির আবিষ্কার খাবার-দাবারের ক্ষেত্রে এক নব যুগের সূচনা করে। আজকের ইউরোপের অনেক খাবার দাবারের পেছনে ঐসময়ের পরিবর্তন অনেক বড় একটি জায়গা দখল করে আছে।

কৃষি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপ্লব করেছিল মুসলমানগণ। মাল্টা, কমলা, লেবু, গ্রেফুট আন্দালুসিয়ার আলেমদের আবিষ্কার। আন্দালুসিয়ার যে সকল আলেম-উলামা কৃষি নিয়ে গবেষণা করতেন তারাই এই সকল কিছুর সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেন।

যেমন, মাল্টা, তুরস্কে আসে ১৭৫০ সালের দিকে। প্যারিসে নিযুক্ত উসমানী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ২৮ তম চলেবি মেহমেদ মাল্টা, টমেটোর বীজ নিয়ে আসেন। তখন তিনি এমন ভাবে নিয়ে আসেন যে, যেন এগুলো ফ্রান্সে আবিষ্কার!

এই সকল মাল্টা ও টমেটো দেখে যারা সেই সময়ে পাশ্চাত্যের মোহে অন্ধ ছিল তাদের মোহ



আরও বেড়ে যায়। অথচ ফ্রান্স এগুলো শিখেছিল আন্দালুসিয়ার মুসলমানদের কাছ থেকে। এই জন্য আমাদের উচিত হল আমাদের অতীতকে নিয়ে গবেষণা করা এবং আমাদের আত্মবিশ্বাসকে বৃদ্ধি করা। এগুলো জেনে বসে থাকলে চলবে না। কুরানের আহবানের আলোকে আমাদেরকে পুনরায় জ্ঞান-গবেষণায় মনোনিবেশ করতে হবে।

মূলঃ মুহাম্মদ এমিন ইলদিরিস

অনুবাদঃ বুরহান উদ্দিন

-

কার্টেসীঃ ইসলামের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস

alammin5g

## ইতিহাসের শিক্ষা:১২

মিসর ও স্পেন

### আতিক উল্লাহ

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে মিসরীয় সভ্যতা সবচেয়ে প্রাচীন। হাজার বছর ধরে এখানে বাস করে আসছিলো কিবতিরা (কপটিক)। এরা ছিলো ধর্মের দিক থেকে খৃস্টান। এদের অস্তিত্ব আজো দেখা মেলে। এই কপটিকরা খৃস্টান হলেও তাদের অনেক রিচুয়াল (ধর্মীয় কৃত্য) ইহুদিদের সাথে মিলে যায়। ধারণা করা হয়ে থাকে, এই কপটিকরা ইহুদি ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, মুসা (আ.) এর যুগ থেকে।

উমার (রা.) এর যুগে মিসর ইসলামী খিলাফতের অধীনে আসে। আমর ইবনুল আস মিসর জয় করেন। এরপর মিসরের পুরো কৃষ্টি-কালচারই বদলে যায়। ভাষা বদলে যায়। ধর্ম বদলে যায়। দলে দলে মিসরীয়রা খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। এতটাই পরিবর্তন হয়েছে যে, দেশটা আফ্রিকার বলয়ে অবস্থিত হলেও, মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।

পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশেদীনের পর, সর্বপ্রথম যে বড় দেশটি মুসলিম সালতানাতের অধীনে আসে সেটা হলো স্পেন।

৯২ হিজরি, ৭১১খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা এই দেশ জয় করেন। ৮৯৬ হিজরি, ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আটশ বছরব্যাপী মুসলমানরা এই দেশ শাসন করেন।

এই দীর্ঘ সময়ে মুসলমানরা এই দেশে অনেক বড় বড় কীর্তির জন্ম দেন। সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-কৃষি-চিকিৎসাবিজ্ঞান সহ জ্ঞানের আরো অসংখ্য শাখায় বিপুল অবদান রাখেন স্পেনের মুসলমানরা।

তখনকার স্পেন ছিলে বাকি অন্যান্য মুসলিম অঞ্চলগুলো থেকে অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো স্পেন তখন মিসর থেকে এগিয়ে থাকার পরও কেন আজ মুসলমানদের হাতছাড়া? মিসর পিছিয়ে থেকেও আজ মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত?

এর উত্তর একটা মূলনীতি দিয়ে দেয়া যায়। তা হলো:

-যে সব ভূখ- সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিজিত হয়েছে, তার প্রায় পুরোটাই আজো মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত।

আর যে সব ভূখ- সাহাবায়ে কেরামের পরে বিজিত হয়েছে, তার অনেক দেশই আজ অমুসলিম দেশের অন্তর্ভুক্ত।

এর কারণ কি?

কারণ হলো, সাহাবায়ে কেরাম প্রথমে ছিলেন ইসলামের দায়ী। তারপরে বিজেতা। তারা নিজেরা ক্ষমতা লাভের চেয়ে, বিজিত অঞ্চলের জনগণকে আল্লাহর ক্ষমতার অধীনে নিয়ে আনার প্রতিই বেশি আগ্রহী ছিলেন। তারা বিজিত জাতিকে নিজেদের শাসনাধীনে আনার চেয়ে ইসলামের শাসনাধীনের আনতেই বেশি মেহনত করতেন।

তার ফল এই দাড়িয়েছে, ইসলাম বিজিত জনগোষ্ঠীর কাছে বিজেতার ধর্ম না হয়ে নিজেদের ধর্মে পরিণত হয়েছে।

alammin5g

শৈরশাসক ফ্রান্সো ১৯৬৭ সালে স্পেনিশ জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ লাভের এক ডিক্রি জারী করে। ঘোষণার পর প্রায় ৬০০ পরিবার নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে ঘোষণা করে। এদের কেউ কেউ নবমুসলিম, কেউ কেউ অভিবাসী মুসলিম তবে বড় একটি অংশ ছিল ‘সেই মুসলিম যুগ থেকে চলে আসা পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারকবাহী মুসলিম। গোপনে ইসলাম ধর্ম পালন করে আসছিল। এরা ‘মরিস্ক’ নামে পরিচিত ছিল। -আতিক উল্লাহ



অণুগল্প:২৪৮

মনে পড়ে!

আতিক উল্লাহ

স্পেনের একটা সাগরতীরবর্তী গ্রাম। ছেলে মাদ্রিদ থেকে ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। মা দেখলেন ছেলে ঘরে কেমন করে ওঠবস করছে:

-কী করছিস রে হোসে!

-নামায পড়ছি!

-নামায কী?

-এটা মুসলমানদের প্রার্থনা। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি! তাই আমি নিয়মিত এটা আদায় করি!

-মুসলমানরা বুঝি এভাবে ব্যায়াম করে প্রার্থনা করে?... তাহলে কি আমার দাদু মুসলমান ছিলেন?

-একথা কেন বলছ?

-আমার আবছা মনে পড়ে, একদম ছোটবেলায়, আমি দাদুকে এভাবে ওঠাবসা করতে দেখেছি।

তার মৃত্যুর পর আর কাউকে ওটা করতে দেখিনি!

alaminn5g

এই যায়তুন গাছগুলো স্পেনের গ্রানাডায়। আমরাই এগুলো রোপন করেছিলাম। প্রায় ১০০০ বছরেরও আগে। এখন আমাদের গাছের ফল তারা খাচ্ছে। শুধু কি গাছের ফল ? ওদের বর্তমানের ভিতটাও তো অতীতে আমাদেরই গড়ে দিয়ে আসা!

হায় আন্দালুস! - **আতিক উল্লাহ**





এ-ফিরদাওস একদিন আমাদের ছিল।  
এ-ফিরদাওস আবার আমাদের হবে।  
ইনশাআল্লাহ।  
কর্ডোভার মসজিদ ও বাগান



ফুল কার না ভাল লাগে!  
ফুল দেখলে মনটা আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে!  
তবে কিছু ফুল আনন্দের বদলে বেদনা নিয়ে আসে!  
একরাশ কষ্টের স্মৃতি বহন করে। জাগিয়ে তোলে দগদগে ঘা!  
ছবির ফুলগুলোও জাগিয়ে তুলেছে সেই পুরনো ক্ষত!  
বর্তমান কর্ডোভার একটি বাড়ির আজিনার বাগান!  
প্রতিটি ফুলে লেপ্টে আছে আটশ বছরের ‘হাহাকার’!  
ও কর্ডোভা! হায় কুরতুবা! আমাদের হারানো ফিরদাওস!  
সেদিনের আন্দালুস! আজকের স্পেন!  
আমাদের হবে! আন্দালুস পতনের পর থেকেই স্পেনকে উদ্ধার করা, মুসলিম উম্মাহর উপর  
‘ফরযে আইন’ হয়ে আছে!  
ইনশাআল্লাহ! আবার আমাদের হবে!  
ইজাবেল্লা! ফার্ডিন্যান্ড!  
ইরাক-সিরিয়ার ঝামেলাটা মিটলেই ইনশাআল্লাহ আমরা আসবো!  
অবশ্যই আসবো! প্রস্তুত থেকো!



## ইতিহাসের শিক্ষা: ২৮ জিব্রাল্টার প্রণালী

-আতিক উল্লাহ

আহমাদ মুখতার। তিনি আন্দালুসের ইতিহাসের ওপর ডক্টরেট করেছেন। তিনি বললেন :  
--- আমার ছোট বেলা থেকেই ইতিহাসের প্রতি ঝোঁক। বিশেষ করে আন্দালুসের ইতিহাস। সে সুবাদে আমি আন্দালুসের ইতিহাস সম্পর্কিত যত জায়গা আছে, সবখানে গিয়েছি। এখনো যাচ্ছি। এবার গেলাম মরক্কোতে। উপকূলীয় শহর তানজায়।

আমার ইচ্ছে ছিল জিব্রাল্টার প্রণালীটা স্বচক্ষে দেখবো। এই প্রণালীটা জাবালে তারেক ও সাবতা শহরের মাঝে অবস্থিত।

আইনত সাবতা শহরটা মরক্কোর অংশ। কিন্তু স্পেন শহরটা জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। ছোট শহরটাতে স্পেনিশ সেনাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। আমি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সাবতায় গেলাম।

গবেষণার কাজে গিয়েছি, তাই চেষ্টা করলাম সেখানকার উচ্চপদস্থ কোনও অফিসারের সাথে দেখা করতে। অনুমতি মিলল। জেনারেল মিগুয়েল আমাকে অনেকক্ষণ সময় দিলেন। কথা বলার এক পর্যায়ে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে আমি জেনারেলকে প্রশ্ন করলাম:

-এই শহরটা তো আইনত মরক্কোর নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা?

-হ্যাঁ, অনেকটা তাই।

-তাহলে আপনারা এটাকে জবরদখল করে রেখেছেন কেন?

আমার প্রশ্ন শুনে জেনারেল রাগ করলেন না। বরং হাসিতে ফেটে পড়ে বললেন:

-আমরা এই বিপদজনক স্থানটা অরক্ষিত রেখে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুই, আর আপনারা আরেকজন তারেক পাঠিয়ে স্পেন দখল করে নেন আর কি!

..

আমরা কি আসলে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি? কিন্তু প্রতিপক্ষ তো ইতিহাসের প্রতিটি বাঁক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আসছে।

শত শত বছর পরও সে শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে না। পূর্ণ সচেতন থেকেই কাজ করে যাচ্ছে।  
= আর আমরা?

## আন্দালুসের একটুখানি সোনালি অতীত

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

লেখক, গ্রন্থাকার-অনুবাদক ও মাদরাসাশিক্ষক

আন্দালুসের (মুসলিমদের হারানো স্পেন) ইতিহাস নিয়ে লিখতে বসলে চোখের আগে মন কাঁদে। (কাজি কবির ভাষায়) ‘সে কাঁদনে আঁসু আনে’ অভাগা চোখে! নিজের অজান্তেই বারবার দৃষ্টি ঝাঁপসা হয়ে আসে। ইতিহাসকে আশ্রয় করে লিখতে চাইলেও তখন তা আর হয়ে ওঠে না। ঐতিহ্য হারানোর বেদনায় মনের সব সত্য কল্পনা একটা সুর বাজতে থাকে। বাজতেই থাকে। এ সুর-ব্যঞ্জনায় যেনো বিশ্বমানবতা কেবলই বিলাপ করতে থাকে। অশ্রু ছলোছলো চোখে কলম ধরে বসে থাকি। বসেই থাকি। কলম কি চলবে না?

ভাঙা-ভাঙা শব্দে বেদনার নীলগাথা হোক না একটু লিখা!

ইতিহাসের নদী এখন হয়ে যাক বেদনার নীলবাহিত স্রোত!

সবুজে সবুজে ‘জান্নাতময়’ আন্দালুস হারানোর স্মৃতিচারণ হয়ে উঠুক এখন কোনো তাযিয়াতি জলসা!

আন্দালুসপ্রেমীর মনে বয়ে চলুক শোকের নদী।

চোখে নেমে আসুক পূঞ্জীভূত বেদনার শত হাহাকার।

নতুন আন্দালুসের দিকে মহাযাত্রার মহাঅভিলাষে —

মন গগণ-বিদারি চীৎকারে আবার হয়ে উঠুক দুর্বিনীত!

দুই.

৭৭১ সাল। হিজরি ৯২। উমাইয়া সালতানাতের আমীরুল মুমিনীন তখন ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক। ইসলামী সালতানাতের সবুজ মানচিত্রে যোগ হয়েছে ভূ-খণ্ডের পর ভূ-খণ্ড। সামরিক কৌশলগত কারণে এবং ভিতরগত জুলুম-নিপীড়ন ও অরাজকতার কারণে আন্দালুস বিজয় করা—সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছিলো। বিশেষ করে রাজা রডারিক কাউন্ট জুলিয়ানের মেয়ের শ্রীলতাহানি করার পর এবং মুসলমানদের কাছে জুলিয়ানের সাহায্য চেয়ে পাঠানোর পর অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো আন্দালুস অভিযান।

তাই ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠালেন — আফ্রিকা বিজয়ের পর সেখানকার শাসনকর্তা—মুসা ইবনে নোসায়র। অনুমতি মিললে প্রথমে তিনি একটি ছোট অভিযান পরিচালনা করলেন ৫০০ সৈন্যের। তারা সীমান্ত এলাকায় বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করে প্রচুর মালে গনিমত নিয়ে ফিরে আসে। এরপরই মুসা ইবনে নোসায়র মূল



অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ৭ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করেন আর নেতৃত্ব তুলে দেন তারিক বিন যিয়াদের কাঁধে। তারিক বিন যিয়াদ মূসা ইবনে নোসাইয়র-এর হাত ধরেই ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং তার আস্থাভাজন সেনাপতিতে পরিণত হন। ‘তানজা’ বিজয়ের পর মূসা তাকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

তিন.

যেতে হবে সমুদ্রপথে। জাহাজ লাগবে অনেক। কারো মতে তখন ব্যবস্থা ছিলো মাত্র ৪টি জাহাজের। তাও আবার ভাড়া করা। কেউ বলেন— না, তখন এ অভিযানকে সামনে রেখেই তৈরী করা হয়েছিলো অনেক জাহাজ। কিন্তু জাহাজ-যে কম ছিলো— এটিই ঐতিহাসিকভাবে বেশি নির্ভরযোগ্য মত। যাইহোক; সেই জাহাজে করেই শুরু হলো আন্দালুস অভিযানে নৌ-অভিযান। সবাই একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব হলো না। যেতে হলো দলে দলে। যারা গেলো তারা পাহাড়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিলো। আত্মগোপনের মতো করে অবস্থান করলো। সবাই আসার পর তারিক বিন যিয়াদ যুদ্ধের জন্যে ধীরে ধীরে সবাইকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। রণকৌশলের অংশ হিসাবে প্রথমেই আশপাশের এলাকাগুলো তিনি বিজয় করে ফেললেন। আলজাযিরাতুল খায়রা বা ‘সবুজ দ্বীপ’ এলাকাটি ছিলো পাহাড়ের (জাবালুত তারিক-এর) মুখোমুখি। প্রথমেই তিনি এ সবুজ-শ্যামল এলাকাটি দখল করে ফেললেন। সেই সঙ্গে আশপাশের আরো কিছু এলাকা। এরমধ্যেই সম্রাট লডারিকের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেলো যে, মুসলিম সৈন্যরা আন্দালুসে পা রেখেছে। লডারিক অবিলম্বে তাদেরকে মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলো। প্রথমেই পাঠালো একটি বিশেষ বাহিনী। কিন্তু সে বিশেষ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হলো তারিক বাহিনীর কাছে। একজন মাত্র জানে বেঁচে পালিয়ে গিয়ে লডারিককে জানাতে পারলো শুধু নিজের বেঁচে-যাওয়ার আশ্চর্য কাহিনী!

এরপর লডারিক নিজেই যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা দিলো। সাজসাজ রবে প্রস্তুত হলো এক লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী। এক সময় যাত্রা হলো এ বাহিনীর। ওদের চোখে-মুখে দম্ব ও অহমিকা ঠিকরে পড়ছিলো। লডারিকের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে খৃষ্টান বাহিনী — এ-খবর যথা সময়ে তারিক জানতে পারলেন। লডারিকের সাথে মহাযুদ্ধে নামার আগেই তারিক আরো সৈন্য চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন মূসা ইবনে নোসায়রের কাছে। যথা সময়ে সে সাহায্যও এসে গেলো। আরো ৫০০০ সৈন্য এসে যোগ দিলো মুসলিম শিবিরে। এখন মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ১২ হাজার।

‘শাদুনা’ শহরের কাছে ‘ওয়াদি লাক্কা’য় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারিক বাহিনী ও লডারিক বহর। মাত্র ১২ হাজার সৈন্য দেখে লডারিক বাহিনীর আনন্দের কোনো সীমা রইলো না। ওদের চোখে মুখে একটা ভাবই কেবল ফুটে উঠছিলো — তোমাদের যুদ্ধসাধ মিটিয়ে দেবো আমরা মাত্র কয়েকঘন্টায় !

একদিকে এক লাখ আরেকদিকে বার হাজার। ভীষণ অসম চিত্র। মুসলিম সৈন্যদের মনোবলে যেনো দুশমনের সংখ্যাধিক্য কোনো চির ধরাতে না পারে, সে জন্যে তারিক বিন যিয়াদ সৈন্যদের

সামনে দাঁড়িয়ে ইমান জাগানিয়া এক ভাষণ দিলেন— লডারিকের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ঠিক আগে। একটু পরই শুরু হবে যুদ্ধ। কিন্তু তার আগে আমরা নজর দেবো একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে।

চার.

না! সে ভাষণের আগে কিংবা তারও আগে—জাহাজ থেকে নেমে তিনি সবগুলো জাহাজ কিংবা কোনো একটি জাহাজ পুড়িয়ে দেন নি! যারা এ জাহাজ পুড়ানোর ঘটনা প্রচার করে, না-জেনে .. না-বোঝেই প্রচার করে।

কেনো তিনি জাহাজ পুড়িয়ে দেবেন?

কার জাহাজ পুড়িয়ে দেবেন?

যদি ভাড়া করা হয়ে থাকে তাহলে তো এগুলো অন্যের সম্পদ! অন্যের সম্পদ কে পুড়িয়ে দেয়? আর যদি রাষ্ট্রীয় সম্পদ হয়, তাহলে কেনো তিনি এতো দামী জিনিস পুড়িয়ে নষ্ট করে দেবেন? অপচয় হবে না কি?

আর যদি শুধু এ-অজুহাতে তিনি সবগুলো জাহাজ পুড়িয়ে দিয়ে থাকেন যে, এতে মুসলিম সৈন্যরা আর পালিয়ে যেতে পারবে না, যুদ্ধ তাদেরকে করতেই হবে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, তাহলে মুসলিম সৈনিকদের শিশিরশুভ্র চরিত্রে কি ছুরি চালানো হয় না?! এমন বাহিনীই কি তারিখ আন্দালুস বিজয়ের জন্যে নিয়ে এসেছিলেন— যারা পালিয়ে যেতে পারে সুযোগ পেলেই!

আস্তাগফিরুল্লাহ!

পাঁচ.

তারিক বিন জিয়াদের ভাষণে বুঝি যাদু ছিলো। ইমানি চেতনায় ও সংগ্রামী জয়বায় সৈন্যরা দ্ব্যতিময় বীরত্বের প্রহর গোনতে লাগলো। এরপর যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন সে চেতনা ও জয়বা সত্যি সত্যি দ্ব্যতি ছড়াতে লাগলো। আটটি সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের পর মুসলিম শিবিরের পূর্ব আকাশে মহাবিজয়ের লাল সূর্যটি যেনো হাসতে হাসতে উদিত হলো!

সঙ্গে সঙ্গে আন্দালুসের বুকে সূচিত হলো মহাবিজয়ের এক পুণ্যযাত্রা!

আগামী আটশত বছরে গড়ে ওঠবে যে-কালজয়ী গর্বিত সভ্যতা, এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হলো তার মুবারক সফর!

এ অসম লড়াইয়ে শহীদ হলেন তিনহাজার মুসলিম সৈন্য। আর লডারিক পালিয়ে গেলো এবং হারিয়ে গেলো। আর কখনো এ নামটা আন্দালুসের ইতিহাসে প্রবেশ করতে পারেনি। কেউ বলেন: যুদ্ধেই সে মারা গিয়েছিলো। কেউ বলেন পালিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কিছুদূর যেতেই পানিতে ডুবে মারা গেলো।

বন্ধু!

যে-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও বাদশার এ-করুণ পরিণতি, সে বাহিনীর অবস্থা 'ঐ জিজ্ঞাসে



কোন্ জন? তা-যে আরো বেশি করুণ, তা না-বলেও তো বোঝা যায়!

তবুও অগভীর কৌতূহল মিটানোর জন্যে এক কথায় বলা যায় — ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো তার বিশাল সৈন্যবাহিনী!

আন্দালুসের এই অশ্রু ও রক্তগল্প অনেক দীর্ঘ! পাঠক চাইলে আবার আসবো!

alammin5g

## এক চুমুকে ইতিহাস: ৬৯

---

### বিজয় বনাম দখল

--

#### আতিক উল্লাহ

বিজয় মানে কী?

আমরা মিসরকে উদাহরণস্বরূপ নিতে পারি। ইসলামের পূর্বে মিসর ছিল রোমনদের দখলে। মিসরের জনগনকে জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল। তার প্রমাণ?

= যখন মিসরে ইসলাম প্রবেশ করলো, বিজয় সম্পন্ন হলো, মিসরবাসী ইসলামের উদারতা-ন্যায়পরায়নতা অবলোকন করলো, দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলো।

তারা যদি স্বেচ্ছায় খ্রিস্টবাদকে গ্রহণ করতো, এভাবে ধর্মবদলের হিড়িক পড়ে যেতো না।

ঠিক এর উল্টো একটা উদাহরণ দিয়েও বিষয়টা স্পষ্ট করা যেতে পারে:

= মুসলমানরা স্পেনে ছিল ৮০০ বছর। তারপর এলো খ্রিস্টানরা। যদি মুসলমানরা স্পেনকে জবরদখলকারী হতো, তাহলে খ্রিস্টানরা আসার সাথে সাথেই পুরো স্পেন আবার খ্রিস্টান হয়ে যেতো।

কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে ভিন্ন। ইনকুইজিশনের মাধ্যমে তারা বাধ্য করে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বানিয়েছে। লাখো মুসলমানকে শহীদ করেছে। দেশছাড়া করেছে।

ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন, “মুসা ইবনে নুসাইর একবার ফ্রান্সের এক পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে পুরো ফ্রান্সকে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, তিনি আরব সৈন্যদের তার বাহিনীকে शामिल করে ইউরোপকে বিজয় করে কন্সট্যান্টিপোল পৌঁছবেন এবং সেখান হতে নিজ দেশ সিরিয়াতে প্রবেশ করবেন।”

কিন্তু খলিফার নির্দেশে তাদের অগ্রাভিযান থামিয়ে দিতে হয়। তা না হলে হয়ত আজ ইউরোপের ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে হত। তাইতো ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন, “যদি ঐ মুসলমান জেনারেল সম্মুখে অগ্রসর হবার সুযোগ পেতেন, তাহলে ইউরোপের স্কুলে ইঞ্জিলের পরিবর্তে কুরআন পড়ানো হতো এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মাদের রিসালাতের সবকিছু দেওয়া হতো। আর আজকে রোমে পোপের পরিবর্তে শায়খুল ইসলামের হুকুম কার্যকর হতো।”

alaminn5g

## এক চুমুকে ইতিহাস: ১৪৫

### আতিক উল্লাহ

-

ওয়াদি লাক্কার যুদ্ধ। এটা সেই বিখ্যাত যুদ্ধ, যেটাতে তারিক বিন যিয়াদ স্পেনের গথিক রাজ রডারিকের সাথে লড়েছিলেন। ৭১১ সালে।

মুসলিম সেনাসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। খ্রিস্টানদের সেনাসংখ্যা ছিল এক লাখ সাতাশি হাজার। তিন হাজার মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। আর পুরো খ্রিস্টান বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

এ-যুদ্ধের মাধ্যমেই মুসলমানরা স্পেনের মাটিতে পা রেখেছিল। শাম ও রোম বিজয়ের ক্ষেত্রে যেমন ইয়ারমুক ভূমিকা রেখেছিল, পারস্য বিজয়ের ক্ষেত্রে যেমন কাদেসিয়া মূল ভূমিকা পালন করেছিল, ওয়াদি লাক্কার যুদ্ধও তেমনি স্পেন জয়ে মূল ভূমিকা পালন করেছিল।

alaminn5g

আমাদের ইশবীলিয়া।

আমাদের ‘কসরে মুরিক’।

-

তাদের সেভিল।

তাদের মুর প্যালেস।

-

আমরা আসছি। মরক্কো হয়ে। ইনশাআল্লাহ। -আতিক উল্লাহ





দিনলিপি-১৪৮৩

(১৯-১১-১৮)

আন্দালুসিয়ান ‘বারবারা’(১)!

আতিক উল্লাহ

বিদেশে, বিশেষ করে আরবে পড়তে এলে, গরীব দেশের বাবা-মায়ের প্রত্যাশা একটু বেশিই থাকে। ভার্শিটি থেকে যা মাসোহারা দেয়া হয়, তাতে সুন্দর দিন চলে যায়। বাড়িতেও কিছু পাঠানো যায়। তারপরও হজের মওসুমে বাড়তি আয়ের চেষ্টা অনেকেই করে থাকেন। ভার্শিটির ছাত্ররা নানাভাবে হাজি সাহেবানের খেদমত করেন। আমিও চেষ্টা করছিলাম কিছু করার। কিন্তু সুবিধামত খেদমত মিলছিল না। এদিকে হজের আর বেশি দেরী নেই। প্রতিদিন হারামের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করি। পাঁচওয়াক্ত নামাজই হারামে পড়ার চেষ্টা করি। না না, কাজের লোভে নয়। এমনতেই ভাল লাগে। ভার্শিটি বন্ধ, তাই ক্লাসের চাপ নেই। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কিছু করা বৈধও নয়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। আগের বছর হুইল চেয়ার চালিয়েছিলাম। অক্ষম বা বৃদ্ধদের হুইল চেয়ার। হারাম শরীফে পেশাদার হুইলচালক আছে। হুইলচেয়ারকে এখানে বলা হয় ‘আরাবিয়্যাহ’। পেশাদার চালকরা হজের মওসমে অনেক টাকা রোজগার করেন। তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে আমাদের মতো গরীব দেশের ছাত্ররা টিকে উঠতে পারে না।

আমাকে যেভাবেই হোক, কিছু টাকা আয় করতেই হবে। এখানে অনার্স প্রায় শেষ। অনেক দিনের ইচ্ছা, মাস্টার্স লেভেলের পড়াশোনা জামেয়া যায়তুনাতে করব। মানে মাগরিব অঞ্চলে কিছু সময় কাটানোর বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। দাদার কাছে শুনেছি, আমাদের শরীরে ‘বারবার’ রক্ত আছে। মরক্কোর জামেয়া কারাভীনে পড়তে পারলেও হবে। আল্লাহর কাছে অনবরত দু‘আ করেই যাচ্ছি। দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি আমার দু‘আ কবুল করবেনই। আমাদের সাথে তিউনিস ও মরক্কোর কয়েকজন ছাত্র পড়ে। তাদের সাথেও কথা বলেছি। তারা বলেছে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবে। তারা কয়েকটা সুন্দর পরামর্শ দিয়েছে,

ক: যেসব হোটেলে তিউনিস বা মরক্কোর হাজী সাহেবান থাকেন, সেখানে গিয়ে খোঁজ-খবর করা।

খ: হোটেলের বয়-বেয়ারার সাথে পরিচয় গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

গ: হারামে তারা সাধারণত, নিজ দেশের লোকেরা একসাথে থাকার চেষ্টা করে। তাদের আশেপাশে থাকলেও কিছু একটা হতে পারে।

তাদের পরামর্শ ধরে এগুবার চেষ্টা করছি। তবে কাজের সন্ধানেই হারামে আসি, এমনটা ভেবে নেয়া উচিত হবে না। হারামে এসেছি রাব্বের কা‘বার অনুগ্রহ চাইতে। বসে আছি। চোখ তুললেই



‘কা’বা’ দেখা যায়। তিলাওয়াত করছি। একটু পরপর কাবার পানে তৃষিত নয়নে তাকাছি। হাতে আরেকটা কিতাব ছিল, তিলাওয়াতের পাশাপাশি ওটাতেও চোখ বুলাছি। কাওয়ায়েদুত তাফসীর। পাশেই এক ভদ্রলোক বসা ছিলেন। ভদ্রলোক না বলে, বলা ভাল ‘শায়খ’। সুন্দর শূশ্র্ণ-িত। সৌম্য চেহারা। পঞ্চশোর্ধ হবেন। আমাকে বারবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে কালোঘরের দিকে তাকাতে দেখে , বোধ হয় কিছুটা কৌতূহল বশতই জানতে চাইলেন,

-আফওয়ান, আপনার হাতের কিতাবটা একটু দেখতে পারি?

চোখ তুলে তাকালাম। একজন্য ব্যতিক্রমী তিউনিসিয়ান। মাথায় খেজুর আঁশ (মাসাদ)-এর গোলাকৃতির হ্যাট দেখেই বুঝতে পেরেছি, তিনি তিউনিসিয়া থেকে এসেছেন। কি নারী কি পুরুষ, বেশিরভাগ তিউনিসিয়ানের মাথাতেই ওই হ্যাট থাকে। তাদের জামার আলাদা ধরন আছে। পতাকা টকটকে লাল। তাদের জাতীয় পতাকাও আলাদা করে চোখে পড়ে। চাঁদ-তারাবিশিষ্ট। কিতাবটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন। চেহারায় কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠল। পরিচয় জানতে চাইলেন। যতটুকু সম্ভব নিজের পরিচয় তুলে ধরলাম। মানুষটাকে দেখে শিক্ষিত মনে হয়েছে। কথাবার্তা বেশ মার্জিত। অনেক তিউনিসিয়ানের সাথে কথা বলেছি, তারা আরবী যেন বলতেই পারে না। আরবী বলতে গেলে, আগে ফরাসি চলে আসে। শায়খ নিজের কথা বলেছেন। আমিও ফাঁকে ফাঁকে আমার কথা বলেছি। হাশা লিল্লাহ (حاشى الله) আল্লাহর কী অদ্ভুত মহিমা! তিনি জামেয়া যায়তুনাতে অধ্যাপনা করেন। ইসলামি আকীদা ও দর্শন বিভাগে। তার বিবিও জামেয়া যায়তুনার ছাত্রী। তার বড় মেয়েও এই জামেয়াতে পড়ে। আল্লাহর রহমতের কথা বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের কথা চলতে চলতেই মুয়াযযিন একামত দিলেন। নামায শেষ হল। সুনুত পড়ে আবার গল্প শুরু হল। তিনি কৌতূহলভরে আকীদা বিষয়ক প্রশ্ন তুললেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ধরে নিয়েছেন, আমি এখানকার আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। আমাকে রীতিমতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলেন। তার কথায় বুঝলাম তিনি কঠিন ‘আশআরী’। তার অধ্যাপনার বিষয়ও তাই। তাকে প্রস্তাব দিলাম, তার সাথে পরেও এ-বিষয়ে কথা বলতে পারবো কি না, যেহেতু তিনি বিষয়টাতে সুগভীর পাণ্ডিত্য রাখেন, তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব। সানন্দে রাজি হলেন। বিদায় নেয়ার আগে বললেন,

-তোমার পরিচিত কোনও গরীব ছাত্র আছে, যে হজের মওসুমে আমাদের সাথে থাকবে। আমার সাথে ‘আরাবিয়্যা’ চালানোর কাজে অংশ নিবে?

তার কথা শুনে আমি রীতিমতো নির্বাক হয়ে গেলাম। হ্যাঁটতে হ্যাঁটতে কথা হচ্ছিল। থমকে দাড়িয়ে গেলাম। কী হল? তিনি জানতে চাইলেন। কিছু না বলে আমি আবেগ সামলে ফের হ্যাঁটা ধরলাম। একটু পর তাকে বললাম,

-আমি যদি আপনার খেদমতে থাকতে চাই, আপনার কোনও আপত্তি আছে? কথা দিচ্ছি, আমাকে কৃভী ও আমীন পাবেন। ইনশাআল্লাহ।

-তাহলে তো কথাই নেই। তোমাকে সাথে পেলে, আমারও অনেক ভাল লাগবে। আচ্ছা, তুমি মুসা আ.-এর মতো নিজেকে কৃভী দাবি করেছ। তার প্রমাণ দিতে পারবে?

-উপস্থিত প্রমাণ দেয়ার উপায় নেই। আরাবিয়া চালানোর কাজ আমি আগেও করেছি। কোনও সমস্যা নেই। আমি এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞ।

-ঠিক আছে, মুমিনের মুখের কথাই যথেষ্ট। আমার প্রয়োজন ছিল একজন আমীনের। আশা করি তুমি আমীনও হবে।

-জি, ইনশাআল্লাহ। আমার দ্বারা আপনার কোনও খেয়ানত হবে না। আপনি চাইলে, আমি আমার ভার্শিটির কয়েকটা কাগজপত্রের ফটোকপিও দিতে পারি।

-না না, সেটা লাগবে না। শুধু নবীর ভাষায় বলব (نَقُولُ وَكَيْلٌ وَاللَّهُ عَلَى مَا) আমরা যা বলছি, আল্লাহই রক্ষাকর্তা। যে মানুষটির জন্য তোমার সহযোগিতা নিচ্ছি, সেও আমাকে পইপই করে বলে দিয়েছে, يَا أَبَتِ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

আব্বাজী! আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারও থেকে কাজ নিতে চাইলে সেজন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম, যে শক্তিশালী হবে এবং আমানতদারও।

-ইনশাআল্লাহ, আমি আপনাকে নিরাশ করব না। আমি কয়েকদিন যাবত দু'আ করেই যাচ্ছি, رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ করবেন, আমি তার ভিখারী।

হাঁটতে হাঁটতে ফাহদ গেট পার হলাম। জমজম টাওয়ারের সামনে দিয়ে হেঁটে দারুল ইত্তেহাদের পেছনে এলাম। ঈশা হয়ে গেছে। আল্লাহর ঘরের মেহমানগন যার যার হোটেল ফিরছেন। ভীড় কমার অপেক্ষায় কিছুক্ষণ একপাশে দাঁড়ালেন শায়খ। কথা চলছে। একফাঁকে জানতে চাইলাম,

-আপনি কি জাতিতে বারবার?

-জি, একথা কেন জানতে চাইছ?

-আমার দাদাজি বলেছিলেন, আমাদের শরীরে বারবার রক্ত বইছে।

-কিভাবে? এক লম্বা ইতিহাস। বলতে সময় লাগবে। আরেকদিন বলব। শুধু এটুকু বলে রাখি, উসমানি খলীফা সুলাইমান কানুনী যখন ইউরোপ অভিযানে বের হয়েছিলেন, তখন তার সাথে আমার পরদাদাও জানেসারীন বাহিনীর সাথে জিহাদে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন আন্দালুস থেকে।

-সুবহানাল্লাহ! তারপর?

-আমার শরীরে দুই গোষ্ঠীর রক্তধারা বইছে। দাদার সূত্রে আমি বারবার। দাদীমার সূত্রে আমি প্রাচীন মিসরীয় কিবতী। আপনি জানেন নিশ্চয়ই, বলকান অঞ্চলে, তিন হাজার বছর ধরে মিসরীয়দের একটি জনগোষ্ঠী বাস করে আসছে?

-আল্লাহ্ আকবার! এমন কথা আমি জীবনেও শুনিনি। মিসরীয়রা বলকানে গেল কিভাবে?

-ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস, পিরামিড নির্মাণের কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য বিপুল মিসরী কিবতীকে বলকানে পাঠিয়েছিল। সে শ্রমিকরা আর ফিরে আসেনি। ওখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী বাস করে করে এসেছে। নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেই। আমীরুল মুমিনীন সুলাইমান কানুনী ইউরোপ থেকে ফেরার পথে, বলকান হয়ে এসেছিলেন। পথিমধ্যে আমার দাদা অসুস্থ হয়ে

পড়লেন। পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে দেখে, দাদা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পেছনে থেকে গেলেন। তার চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন বলকানী এক মিসরি পরিবার। দাদা আর ফেরেননি। খিলাফাহর অনুমতি সাপেক্ষে বিয়ে-থা করে ওখানেই স্থায়ী বসত গেড়েছিলেন। আমার পরিবারের দু'টি ধারার উৎস নিয়ে আমি একটি মাকাল (প্রবন্ধ) লিখেছি। আপনাকে কাল এনে দেব। ওখানে বিস্তারিত আছে।

-তোমার জীবনবৃত্তান্ত শুনে আমার এখনই মাকালটা পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। সে যাক গে। আগামীকাল পড়ব। ইনশাআল্লাহ। আশা করি বিস্তারিত জানতে পারব। তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি, আমরা হজে এসেছি তিনজন। আমি আর আমার স্ত্রী। এবং আমার আম্মু।

-আম্মু খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছেন বুঝি?

-কেমন সেটা সামনে গেলে বুঝতে পারবে। সামনে গেলে, তুমি চুপচাপ থেক। আমার আম্মুটা খুবই হাস্যাস (স্পর্শকাতর)। অল্পতেই তার অনুভূতিতে আঘাত লাগে। আর বিশেষ কারণে আম্মুটা মানসিকভাবে একটু বিপর্যস্ত। বাইরের কোনও পুরুষকে সহ্য করতে পারে না। তুমি চুপচাপ থাকলে, আমি বাকি কাজ সেয়ে নেব। সে বলেছে, আরাবিয়া চালানোর জন্য মহিলা সহকারী নিতে। কিন্তু আমার মন বলছে, তোমার চেয়ে ভালো সহকারী আর কেউ হতে পারবে না। রাব্বের কা'বাই তোমাকে মুসা বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

ভীড় পাতলা হয়ে এল। গুটি পায়ে এগুতে থাকলাম। এত অল্প সময়েই কারো সাথে এমন হৃদয়তা হয়ে যেতে পারে, জানা ছিল না। আরেকটু এগুতেই শায়খ হাতে চাপ দিয়ে ইশারা করে দেখালেন, অদূরে হুইল চেয়ারে যে বসে আছে, সেই আমাদের মা। আর পাশের জন আমার আহলিয়া।

ইয়া আল্লাহ! আমি ভেবেছিলাম শায়খের জন্মদাত্রী মায়ের আরাবিয়া চালাতে হবে। এ যে দেখি একটি মেয়ে। দূর থেকে দেখলাম, মা আর মেয়ে তন্ময় হয়ে কথা বলছে। ফ্লাডলাইটের আলোতে মা আর মেয়েকে অপার্থিব কোনও জগতের মানুষ মনে হচ্ছে। চোখ নামিয়ে নিলাম। অজান্তেই মুখ দিয়ে বের হয়ে এল, সুবহানাল্লাহ!

দিনলিপি-৪০৮

(১৬-১২-২০১)

একমুঠো ভুয়া ইতিহাস!

-আতিক উল্লাহ

---

(এক) যিরয়াব। তিনি প্রথমে ছিলেন বাগদাদে। পরে আন্দালুসে গমন করেন। তাকে মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম নায়ক মনে করা হয়। ফ্যাশন, বাদি-বাজনাসহ বেশ কিছু যন্ত্রের আবিষ্কর্তা ছিলেন। বাস্তবে তিনি মোটেও নায়ক নন। বরং খলনায়ক। তিনি বহু মানুষের গোমরাহীর কারণ ছিলেন। তার হাত ধরেই আন্দালুসে পাপাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা পতনকেই ত্বরান্বিত করেছিল।

(দুই) উমার রা. নাকি দুর্ভিক্ষের বছর 'হদ' কায়েম করা স্থগিত করেছিলেন। এটা একটা ভুল প্রচার। তিনি কিভাবে আল্লাহর দেয়া আইন স্থগিত করবেন?

(তিন) ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন নি। তারও দুইশত বছর আগে মুসলমানরা আমেরিকা পৌঁছে গিয়েছিল।

(চার) মিসরের একটা ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রে (ওয়া ইসলামাহতে) মামলুক সুলতান ইযযুদ্দীন আইবেককে দুশ্চরিত্ররূপে দেখানো হয়েছে। অথচ এটার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তিনি অত্যন্ত সবল ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

(পাঁচ) আরও কিছু বিষয় আরবীয় চলচ্চিত্রে বেশ কিছুদিন থেকে প্রচার করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে:

ক: রাবেয়া আদাবিয়া মানে রাবেয়া বসরী নাকি আগে নর্তকী ছিলেন। চরম মিথ্যা একটা কথা।

খ: ঈসা বিন আউয়াম রহ.। তিনি ছিলেন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ.-এর একজন সেনাপতি।

গোয়েন্দা। ডুবুরী। তার সম্পর্কে প্রচার করা হয় তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। চরম ভুয়া খবর।

গ: বাজ্জাদ নামে একজন সাহাবীর নামও প্রচার করা হয়। অথচ কিতাবপত্রে বাজ্জাদ নামে কোনও সাহাবীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

ঘ: নবীজি (সা.)-এর এক দুধবোনের নাম ছিল শীমা বিনতে হারেস। তিনি হাওয়ায়েন গোত্রের সাথে বন্দী হয়েছিলেন। তার সম্পর্কে প্রচার করা হয়, তিনি যুবতী বয়েসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ভুল। নবীজিই তো তখন পঞ্চশোধ!

ঙ: নাজ্জাশী রহ. সম্পর্কে বলা হয়, তিনি প্রথমে ক্রুশের পূজো করতেন। ভুয়া। তিনি ইসলাম

গ্রহণের আগে ‘একত্ববাদে বিশ্বাসী’ ছিলেন। মেসেজ চলচ্চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে।

চ: কিছু কিছু ঐতিহাসিক ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছে, ইংল্যান্ড অধিপতি রিচার্ড বন্দীদের প্রতি দয়ালু ছিলেন। তার হৃদয়ও ছিলো খুবই ভালো। এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যাচার হতে পারে না।

(ছয়) ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন মিসরে একজন অত্যাচারী বর্বর দখলদার হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিলো। জ্ঞানের মশালবাহক হিসেবে নয়।

(সাত) উসমানি খিলাফাহকে আরবের মুক্তচিন্তার অনেক বুদ্ধিজীবী ‘দখলদার শক্তি’ হিসেবে চালিয়ে দিতে চান। সুস্পষ্ট ইতিহাসবিকৃতি। অনেক খলীফা সারাজীবন জিহাদে কাটিয়েছেন। পরিপূর্ণ শরীয়ত মেনে শাসন করেছেন।

(আট) জাওহার সিকিল্লিকে অনেক বড় মুজাহিদ মনে করা হয়। অথচ এই ব্যাটা একজন খবীস ইসমাইলি শী‘আ। আজীবন আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছে। পাশাপাশি মুইয লিদ্বীনিলাহও ছিলো একজন নিকৃষ্ট শী‘আ শাসক। আহলে সুন্নাতের বহু আলিমের রক্ত তার হাতে লেগে ছিল। ফাতেমী খিলাফাহটাই ছিলো ভূয়া নামে প্রচারিত। তাদের সাথে আহলে বাইতের দূরতম সম্পর্কও ছিলো না।

(নয়) মুহাম্মাদ আলী পাশাকে মনে করা হয় মিসরের ত্রাতা। আধুনিক মিসরের জনক। বাস্তবে এই লোক ছিলো ওলামায়ে কেরামের হত্যাকারী। দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচারকারী।

(দশ) মিসরের রাজা ফারুকও ছিলো সমান অপরাধী। তবে তার আমলে মিসরের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল। মিসরের এক জুনাইহের বিনিময়ে তিন মার্কিন ডলার পাওয়া যেতো। সামরিক শাসন এসে মিসরের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে।

(এগার) ১৯৫২ সালে মিসরে সংঘটিত ঘটনা কোনও বিপ্লব ছিলো না। ছিল সামরিক অফিসারদের বিদ্রোহ। অথচ তারা প্রচার করেছিল বিপ্লব বলে। মুহাম্মাদ নজীবকে দুর্বল শাসকরূপে চিত্রিত করেছিল।

(বারো) অনেক ভুল হাদীসও আমাদের মাঝে প্রচলিত:

ক: আবু তালেবের সাথে, ডান হাতে সূর্য, বাম হাতে চন্দ্র দেয়ার যে ঘটনা প্রচলিত আছে, এটারও ভিত্তি নেই।

খ: হিজরতের পথে দুই কবুতরের ঘটনারও কোনও ভিত্তি নেই।

গ: নবীজির ঘরের সামনে এক ইহুদির ময়লা ফেলার ঘটনারও কোনও ভিত্তি নেই।

ঘ: মক্কা বিজয়ের দিন নবীজি বলেছিলেন: যাও তোমরা সবাই মুক্ত। এই হাদীসটা নিয়েও কোনও

কোনও মুহাদ্দিস আপত্তি করেছেন।

ঙ: হিন্দা বিনতে উতবা (রা.) সম্পর্কেও প্রচলিত আছে: হামযা রা.এর কলিজা চিবিয়ে খাওয়ার কথা। বাস্তবে তিনি কলিজা খান নি।

alammin5g



## এক চুমুকে ইতিহাস: ৩১৭ জুরজি যায়দান!

### আতিক উল্লাহ

লেখকের যদি পাঠকপ্রিয়তা থাকে, আর গল্প-উপন্যাস যদি তার সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হয়, তাহলে তিনি বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করেন। তিনি সহজেই পাঠকের কাছাকাছি চলে যেতে পারেন। গল্পছলে ভাল কথা বলতে পারেন। অসং লেখক হলে, গল্পের মাঝে দুয়েকটা বিষাক্ত কথাও দিয়ে দিতে পারেন। পাঠক সরলমনে গরল গিলে ফেলে। বাংলাভাষায় মীর মশারফ হোসেনের ‘বিষাদসিন্ধু’র কথা ধরতে পারি। এই একটা বই, বাংলাভাষী মানুষকে কতটা বিভ্রান্ত করেছে, বলে শেষ করা যাবে না।

আরবী ভাষায় তেমনি একজন হলেন কউর খ্রিস্টান লেবানিজ লেখক ‘জুরজী যায়দান’ (১৮৬১-১৯১৪)। ইসলামের ইতিহাসচর্চায় যত বিকৃতি বর্তমানে ছড়িয়ে আছে, তার অধিকাংশই এই খ্রিস্টান উপন্যাসিকের ‘কারসাজি’। ইউরোপের ঐতিহাসিক তো বটেই, অনেক মুসলিমও তার ইতিহাস বিকৃতিকারী ‘অপন্যাসগুলোতে’ বিবৃত বিকৃত ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

বাইরুতে বেড়ে উঠেছেন। বাবা খাবারের হোটেল চালাত। জুরজি মুচির কাজ শিখেছেন পেশা হিসেবে। পাশাপাশি পড়াশোনাও চলেছে। মিসরে এসে ইংরেজদের অধীনে অনুবাদকের কাজ করেছেন। ১৮৯৬ সালে ‘আলহেলাল’ পত্রিকা বের করা শুরু করেছেন। এই পত্রিকাকে ঘিরেই তার সাহিত্য সাধনা পুরোদমে শুরু হয়েছিল। আকর্ষণীয় ভাষায় বেশ কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। ইসলামি ইতিহাসের বিখ্যাত চরিত্রসমূহকে উপজীব্য করে। আরব জাতীয়তাবাদ আর আরবি ভাষা-সাহিত্য আন্দোলনের আড়ালে, আজীবন ইতিহাস বিকৃতির প্রহসন চালিয়ে গেছে। আল্লামা শিবলী নুমানী রহ.ও তার ভ্রান্তিগুলো নিয়ে লিখেছেন।

জুরজি যায়দানের মতো, চতুর্থের সাথে সমকালীন আর কোনও লেখক ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করতে পারেনি। জুরজির কাছ থেকেই অধিকাংশ ‘প্রাচ্যবিদরা’ ইতিহাস গ্রহণ করেছে। অথচ জুরজি লিখেছিলেন ইতিহাস। তার বিখ্যাত একটি বই হচ্ছে (تاريخ التمدن الإسلامي) ইসলামি সভ্যতার ইতিহাস। শিবলী নুমানী এই বইয়ের ভ্রান্তিগুলো নিয়েই লিখেছিলেন।

(১): গাসসানী ‘কইন্যা’ (فتاة غسان) বইয়ে, আল্লাহর রাসূল সা.-সহ ইসলামের প্রথম প্রজন্মের সেরা মানুষগুলোকে সুকৌশলে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। তারা প্রচ- দাপুটে, হত্যা ও লুণ্ঠনকারী, এমন একটি চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন এই লেখক।

২: মিসরের আরমানুসা (أرمانوسة المصرية) বইয়ে, মহান সাহাবী আমর বিন আস রা.-এর জীবনকে

প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়েছে। মুসলমানদের দেখিয়েছে, সহজ সরল বোকা আর নির্বোধরূপে।  
৩: কুরাইশকুমারী (عزراء قريش) বইয়ে, উসমান, আলি ও আয়েশা রা.-এর সীরাতবিকৃতির অপচেষ্টা করেছে।

৪: সতেরই রমযান (رمضان ১৭) বইয়ে, উমাইয়া খলীফাগনের চরিত্র হনন করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে।

৫: আন্দালুস বিজয় (فتح الأندلس) বইয়ে, তারিক বিন যিয়াদ ও মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর চরিত্র সীরাত বিকৃতির চেষ্টা চালিয়েছে।

৬: চার্লস ও আবদুর রহমান (شارل وعبد الرحمن) বইয়ে, মহান মুজাহিদ আবদুর রহমান গাফেকী রহ.-এর জীবনী বিকৃতির ঘৃণ্য প্রয়াস চালিয়েছে।

৭: আবু মুসলিম খুরাসানী (أبي مسلم الخراساني) বইয়ে, দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা মনসুরের জীবনী বিকৃতির চেষ্টা চালিয়েছে।

৮: রশীদভাদ্রী আব্বাসাহ (العباسة أخت الرشيد) বইয়ে, মহান খলীফা হারুনুর রশীদ রহ.-এর জীবনী বিকৃতির হীন প্রয়াস চালিয়েছে।

৯: উসমানি বিপ্লব (الانقلاب العثماني) বইয়ে, মাজলুম খলীফা আবদুল হামীদ (২য়) রহ.-এর জীবনী বিকৃত করা হয়েছে। এই বইয়ের প্রভাবে অনেকেই এই খলীফার প্রতি অবিচার করেছে।

১০: এভাবে এই দুষ্ট লেখক একাধারে খলীফা মু'তাসিম, মিসরের আহমাদ বিন তুলুন রহ., আন্দালুসের খলীফা আবদুর রহমান নাসির রহ., মহান মুজাহিদ আব্বাসী খিলাফাহর পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা সুলতান রুকনুদ্দীন বায়বার্স রহ., আইনে জালুতের বিজয়ী বীর সাইফুদ্দীন কুতুয রহ., সুদানের মুহাম্মাদ আহমাদ মাহদীসহ আরও অনেকের জীবনী বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে।

মোটকথা, এই লোক একটা গোপন এজেন্ডা নিয়ে সাহিত্য চর্চায় নেমেছিল। এবং সফলও হয়েছিল। তার বিকৃত ইতিহাসের জঞ্জাল সরিয়ে, বিশুদ্ধ ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করতে, মুসলিম ঐতিহাসিকদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। মুসলিম ঐতিহাসিকগণের অক্লান্ত প্রয়াস সত্ত্বেও জুরজি যায়দানের রেখে যাওয়া 'ছাঁই পাশ'-এর প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সাহিত্যের মাধ্যমে, একবার কোনও 'বিষ' বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে ছেড়ে দিতে পারলে, সহজে তা উপড়ানো যায় না। যুগের পর যুগ পার হয়ে যায়। সেই বিষের মাশুল গুনে যেতে হয়। বিষাদ সিন্ধুকেই দেখি না, এখনো বাংলাসাহিত্যের কোনও কোনও পাঠক, এ-বইয়ে সন্নিবেশিত তথ্যকে সঠিক বলে মনে করে। অন্তত সবটা না হলেও, কিছু কিছু সঠিক, এটা মনে করেই।

উপনিবেশিক আমলে, আমরা নানাদিক দিয়েই জুলুমের শিকার হয়েছি। সে জুলুমের রেশ আজও কাটেনি। আমরা সচেতন না হলে, এই রেশ কখনোই কাটবে না।

ফুটবল খেলাই এখন এই শহরগুলোর ধ্যান-জ্ঞান। ফুটবলাররাই শহরবাসীর আইডল। বিশ্ব দরবারেও শহরগুলোর পরিচিতি এখন ফুটবলের স্বর্গরাজ্য হিসেবে।

অথচ একসময় এই গ্রানাডা, বার্সেলোনা, মাদ্রিদ ছিলো আমাদের। খিলাফার ঝাণ্ডা উড়তো শহরের প্রাচীরগুলোতে। মানুষ ব্যস্ত থাকতো ঐশী গ্রন্থে। বলিয়ান থাকতো ঐশী শক্তিতে।

আবার আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে এ শহরগুলো। যে শহরগুলো মুসলিম বরপুত্র তারিক বিন যিয়াদ আমাদের কাছে আমানত রেখে গেছে।

alammin5g

খেলাফাত  
তুমি হারিয়ে গেছ  
তোমার ত্রিশ বছর বয়সে  
বহুধারীয় তত্ত্বের ভীড়ে  
তুমি আজ মৃত

তুমি জাননা খিলাফাত  
তুমি ছিলেনা বলে  
কত যুলুম অত্যাচার  
ক্রন্দন রোনাজারি ও রক্তপাতের  
দরিয়া দেখেছে আসমান ও সৌরজগত

তুমি জাননা তোমার অভাবে  
কত মাশুল গুণেছে এই পৃথিবী  
কত আহাজারি অনুশোচনায় দ্ব্যলোক ও ভূলোক

অতীত বিবরণে তোমাকে আর  
ব্যথিত করতে চাইনা হে খিলাফাত

তুমি জেনে রাখ  
জঠর জ্বালা ভুলে  
তোমাকে পুনর্জন্ম দিতেই  
আমাদের আগমন

তুমি জাননা খিলাফাত  
আমাদের মাঝে কে আছে  
এবং অচিরেই তুমি জানতে পারবে  
তোমাকে জন্ম দিতে কারা এগিয়ে আসছে

তোমাকে ওয়াদা করছি হে খিলাফাত  
আগামীতে আর কোন  
দেশ বিদেশের নয়  
নয় কোন জন্মদিন  
কোন রাষ্ট্র ও সমাজের  
নয় কোন জন্মদিন

আর কোন সীমানা ও সংবিধানের  
আগামীতে কেবল এবং একমাত্র  
তোমার জন্মদিনই পালন করবে আ-বিশ্ব

—

(( অপরিমার্জিত ও সংক্ষিপ্ত ))

২৫/১২/২০১৮

[#মুহাম্মাদ\\_মুজাহিদুল\\_ইসলাম\\_কবিতায়](#)

alammin5g

## ইতিহাসের শিক্ষা:২২ সালাহুদ্দীনের ইহুদি চিকিৎসক

### আতিক উল্লাহ

এক: এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকায় (১৯৮৪) বিজ্ঞানের ইতিহাস (হিস্ট্রি অব সায়েন্স) প্রবন্ধে লেখা হয়েছে:

--- যখন ইসলামী সভ্যতা যখন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, ইউরোপ তখন ছিল অজ্ঞাতনতার নিকষ অন্ধকারে নিমজ্জিত। সপ্তম শতাব্দী থেকে ইসলামের বিজয় পতাকা চারদিকে উড়তে শুরু করেছে, দশম শতাব্দী আসতে আসতে অবস্থা এমন দাঁড়াল, ইরান থেকে নিয়ে স্পেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখন্ড আরবী ভাষার অধীনে চলে এল।

\*\*\* ইসলাম যেখানেই গিয়েছে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যাপক পাঠচর্চার বিকাশ ঘটিয়েছে। কর্ডোভার পাঠাগারেই তখন কিতাবের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লাখ। অথচ পুরো ইউরোপ টুঁড়েও পাঁচ হাজার কিতাব পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ।

\*\*\* মুসলমারা শুধু নিজেরাই এগিয়ে যায় নি, অমুসলিমদেরকেও আগে বাড়ার সুযোগ দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সুযোগ পেয়েছে ইহুদিরা। মধ্যযুগে ইউরোপে যখন ইহুদিদের বেঁচে থাকাটাই দুর্লভ হয়ে পড়েছিল, সে সময় তারা স্পেনে ছিল রাজার হালে।

দুই:

-মুসা বিন মায়মুন (১১৩৫-১২০৪)। তিনি ছিলেন একজন ইহুদি বিজ্ঞানী। তিরি ক্যালডীয় ভাষা, গ্রীক ভাষা, হিব্রু ভাষা, আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

ইহুদিদের কাছে তার এতটাই মর্যাদা ছিল যে, তারা তার ব্যাপারে বলতো:

-মুসার (আ.) পরে মুসার (বিন মায়মুন) মতো আর কোনও মুসা জন্ম নেয় নি।

\*\*\* মুসা বিন মায়মুন কর্ডোভায় জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানেই লেখাপড়া ও বেড়ে ওঠা। পরিণত বয়সে তিনি মিসরে চলে আসেন। তখন মিসরের শাসক ছিলেন গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রহ.)। সুলতান চিকিৎসা শাস্ত্রে তার ব্যুৎপত্তি দেখে, তাকে খাস চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দেন।

\*\*\* মুসা বিন মায়মুন ইহুদিদের কাছে আরো একটা কারণে আদরণীয়। বর্তমানে ইসরাইলের রাষ্ট্র ভাষা হলো হিব্রু। তিনি কর্ডোভায় থাকাকালে, এই হিব্রু ভাষাকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেন। এবং আরবী ব্যাকরণের আদলে হিব্রু ভাষারও ব্যাকরণ রচনা করেন।



\*\*\* হিব্রু ভাষা ও আরবী ভাষা অনেক দিক দিয়েই এক। অবশ্য সমস্ত সেমেটিক ভাষাগুলোর মাঝেই ব্যাপক সাদৃশ্য আছে। বিশ্বের অন্য ভাষাগুলোর চেয়ে সেমেটিক ভাষাগুলোর আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো ডান দিক থেকে শুরু হয়।

\*\*\* সে সালাহুদ্দীনকে ইহুদিরা আজ ঘৃণা করে, যার পৃষ্ঠপোষকতাতেই তারা একদিন বেড়ে উঠেছিল, তাদের ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল। অথচ তারা এখন সব ভুলে গেছে।

\*\*\* মুসলমানরাই ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে টেনে আলোর পথ দেখিয়েছে, তারাই আজ মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালিয়ে তার প্রতিদান দিচ্ছে।

\*\* মুসলিম শাসকরা অমুসলিম প্রতিভাগুলো যথাযথ কদর করতে কখনোই পিছপা হননি। বলা ভাল, মুসলিম শাসকদের উদারতার কারণেই আজ বিশ্বে অন্য ধর্মমত টিকে আছে। না হলে পরিস্থিতি ভিন্নতর হওয়ারও সুযোগ-সম্ভাবনা ছিল।

alaminn5g

কেন হত মুসলিম দেশগুলো আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারছি না।

কারণ, আমরা উদাসিন। আমরা শয়তানের ক্রিড়নক। আমরা অনুভূতি শক্তিহীন। আত্মমর্যাদাবোধ আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। আমরা ভুলে বসেছি আমাদের সোনালি অতীত।

এই পয়লা জানুয়ারি গোটা পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান অনেক ধুমধাম করে থার্টিফাস্টনাইট উদযাপন করল।

অথচ!

অথচ খৃস্টান স্পেন ঠিকই মুসলমানদের কর্তৃত্ব থেকে আন্দালুসকে ছিনিয়ে নেয়ার ঈদ উদযাপন করবে আজ।

হাঁ প্রতি বছর ২জানুয়ারী তারা এই অনুষ্ঠান উদযাপন করে। অনেক ঘটা করে পালন করে। এই অনুষ্ঠানে খৃস্টান স্পেনের জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হয় - একজন আবু আব্দুল্লাহ অসহায় হয়ে খৃস্টান রাজার হাতে গ্রানাডার চাবি হস্তান্তর করছে এরপর চিরবিদায় জানিয়ে চলে যাচ্ছে নিরুদ্দেশের পথে।

আফসোস! ওরা ওদের গৌরবের ইতিহাস উদযাপন করে,  
আর আমরা আমাদের অতীত ভুলে গিয়ে বিধর্মীদের উৎসব উদযাপন করি!!

খোদার কসম! যতদিন না আমরা জাগ্রত হবো, আমাদের অতীত ফিরিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হবো ততদিন আমরা কিছুই করতে পারব না। - আব্দুল্লাহ তালহা

আজকের তামান্না: ৮  
'আল হামরা'র চতুর্থে  
উচ্চকণ্ঠে একবার  
আযান দিয়ে সালাত  
আদায় করা।

## এক চুমুকে ইতিহাস: ২৫২

### আতিক উল্লাহ্

মুসলমানদেরকে সিরিয়া থেকে নির্মূল করার জন্যে ‘ক্রশেড জোট’ গঠিত হয়েছে। ঠিক এমন এক ঘটনা কয়েকশ বছর আগেও ঘটেছিল। ১৫৭৮ সালে। মরক্কো থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে, পোপের উস্কানিতে খ্রিস্ট জোট করেছিল: পুর্তগাল-জার্মানি ও স্পেন।

বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে খ্রিস্টানরা এগিয়ে এলো। তখন মরক্কোর সুলতান ছিলেন আবদুল মালেক (১৫৭৬-১৫৭৮)। তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল উসমানি খিলাফাহ। যুদ্ধটার নাম ছিল ওয়াডি মাখাযির যুদ্ধ বা তিন রাজার যুদ্ধ। খ্রিস্টান পক্ষে ছিল আশি হাজার সেনা। খ্রিস্টপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছিল। খ্রিস্টানদের তিন সেনাপতিই নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল।

এখানেই শেষ নয়, এই যুদ্ধে খ্রিস্টানদের পক্ষ হয়ে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে একজন মুসলিম রাজাও অংশ নিয়েছিল: মুহাম্মাদ মুতাওয়াক্কিল (১৫৭৪-১৫৭৬)। এই রাজাও পানিতে ডুবে মরেছিল। পালাতে গিয়ে।

আরও মজার ব্যাপার হলো, যুদ্ধটা হয়েছিল আগস্টের ৪ তারিখে। এই দিনকে মরক্কোর ইহুদিরা আজো, ঈদের দিনের মতো আনন্দের দিন হিসেবে পালন করে। কারন? মরক্কোর ইহুদিরা এসেছিল স্পেন থেকে পালিয়ে। পুর্তগালের সম্রাট ঘোষণা দিয়েছিল: এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর, মরক্কোর ইহুদিদেরকে ধরে ধরে, একটা একটা করে ছুরি দিয়ে যবেহ করবে, যদি তারা খ্রিস্টান হতে না চায়। ইহুদিরা এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয়কে সরাসরি ‘জিহোভা’-এর দান বলে মনে করেছিল।

আজও খ্রিস্ট জোটের বিরুদ্ধে লড়ছে খিলাফাহ ও কিছু মুসলিম দল। খ্রিস্টানদের সাথে এবারও ‘ইসলামী জোট’ আছে। ফলাফল কী হবে আল্লাহই বলে দিবেন।

## ইসলামি সভ্যতা ও ইতিহাস: ৭

### আতিক উল্লাহ

সউদী বাদশাহ সউদ বিন আব্দুল আজীজ দুইবার, রাষ্ট্রীয়ভাবে স্পেন সফর করেন। ১৯৫৭ সালে আবার ১৯৬২ সালে। তখন স্পেনের ক্ষমতায় ছিলেন জেনারেল ফ্রাংকো ফ্রাংকো। বাদশাহর সফরকালে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। সফরসঙ্গী এক ডাক্তার বলেন, সফরের এক পর্যায়ে বাদশাহ জামে' কুরতুবা যিয়ারত করতে গেলেন। স্পেনে মুসলমানদের চরম বিপর্যয়ের পরপরই এই মসজিদটিকে গীর্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। বর্তমানেও গীর্জা ও দর্শনীয় স্থান হিসেবেই আছে। বাদশাহ মসজিদ যিয়ারতের এক পর্যায়ে হঠাৎ পরিধেয় স্বর্ণখচিত আলখাল্লা মেঝেতে বিছিয়ে জোর আওয়াজে নামাজ শুরু করে দেন। সঙ্গে থাকা যাজকরা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা বুঝে উঠতে পারছিল না করবে। মসজিদ যিয়ারত শেষে বাদশাহ সউদ, ফ্রাংকোকে মসজিদটি ক্রয়ের প্রস্তাব দেন। হাদিয়া হিসেবে বলেন তিনি দশ মিলিয়ন ডলার দেবেন। পুরো মসজিদ দিতে হবে না, সপ্তাহে তিনদিন মুসলমানদেরকে নামাজ পড়তে দিলেই হবে। পাশাপাশি আরেকটা প্রস্তাবও তিনি ফ্রাংকোকে দেন, মসজিদকে আপন অবস্থায় রেখে গীর্জাকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে বলেন। পুরো নির্মাণব্যয় নির্বাহ করারও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেন। মরহুম বাদশাহর প্রস্তাবকৃত হাদিয়ার অংকটা ছিল অবিশ্বাস্য। স্পেনে তখন চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছিল। ফ্রাংকোর কাছে প্রস্তাবটা ছিল অত্যন্ত লোভনীয়। কিন্তু বাদ সাধল পাদরিরা। ১৯৬৬ সালের ঘটনা হলেও এতদিন বিষয়টা গোপনই ছিল। ২০১১ সালে উক্ত গীর্জার (জামে' কুরতুবা) প্রধান পাদরী মৃত্যুর পূর্বে, তার দিনলিপি প্রকাশ করলে সেখানে এই তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে জানা যায়, আর্চ বিশপ হোসে মারিয়াই গীর্জা স্থানান্তরে বাদ সাধার পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ফ্রাংকো এই বিষয়টা তদারক করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার রাফায়েল ডি লাহুজকে। রাফায়েল বলেন, আমার ও ফ্রাংকোর স্বপ্ন ছিল মসজিদকে যথাস্থানে রেখে গীর্জাকে স্থানান্তরের। এই প্রসঙ্গে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, মসজিদটা (গীর্জা) স্পেন সরকার বা জেনারেল ফ্রাংকোর আওতাধীন ছিল না। এই মসজিদের (গীর্জার) মূল মালিক হচ্ছেন ভ্যাটিকানের পোপ বা ভ্যাটিকান চার্চ। ও আল্লাহ! আমাদের মসজিদ কার মালিকানায় সেটা জানিও না বুঝিও না, আপনি আমাদেরকে মসজিদ ফিরিয়ে দিন। আমীন

## ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস:২৬

### আতিক উল্লাহ্

আন্দালুসের কর্ডোভা। তখন খলীফা আবদুর রহমান নাসির (রহ.) এর খিলাফতকাল চলছে। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী। পাঠমনস্ক।

কর্ডোভার কুতুবখানায় তখন সংগৃহীত কিতাবের সংখ্যা ছিল তখন প্রায় ছয় লাখ।

কর্ডোভাতে কিতাবের অনুলিপি করা ও অনুবাদ করা একটা সম্মানজনক পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিতাবপত্র, পড়াশোনার এত ছড়াছড়ির কারণে কর্ডোভার নামই হয়ে গিয়েছিল ‘জাওহারাতুল আলাম’। বিশ্বের মণি।

ইউরোপ তখন ডুবে ছিল অজ্ঞতার চরম অন্ধকারে।

খলীফা নাসির (রহ.) দেশকে পুরোপুরি নিরক্ষরতামুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পুরোপুরি নির্মূল করে ফেলেছিলেন অজ্ঞতাকে। অজ্ঞানতাকে।

এক হাজার বছর যাবত আন্দালুসে নিরক্ষরতার হার ০%। স্বাক্ষরতার হার ছিল ১০০%।

আর আমরা এখন কী করছি? ছোট দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় পর্যন্ত শিক্ষার হার ১০০%। তাদের দেশে সব ধরনের শিক্ষাই বেতনমুক্ত। শিক্ষার সব ব্যয়ভার বহন করে সরকার।



গল্পসল্প- স্বল্পগল্প:৪৫৪

চামচরীতি

আতিক উল্লাহ

মালিক বিন নবি। একজন কুরআন গবেষক। কুরআন কারীম নিয়ে তার বিখ্যাত কিছু রচনা আছে। তার স্মৃতিচারণ:

-১৯৩০ সালের কিছু পরের কথা। আমি শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে আমি ফ্রান্সে উচ্চডিগ্রি নিতে গিয়েছি। আমাদের আলজেরিয়া থেকে তখন অনেকেই ফ্রান্সে যেত। দেশতো তখন এক ছিল। বেশি ঝামেলা পোহাতে হতো না।

আমি সাধারণত রান্না করেই খেতাম। একদিন ভার্শিটিতে কাজের চাপ পড়ে গেল। বাধ্য হয়ে একটা ক্যাফেতে খাওয়া সারতে গেলাম। পুরো ক্যাফেটোরিয়া ছাত্রছাত্রীতে গিজগিজ করছে। কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে, কী করা যায় ভাবছি।

দূরে এককোনে দেখলাম এক টেবিলে একটা আসন খালি আছে। আরেক পাশে দুইটা মেয়ে খাবার খাচ্ছে। বেশভূষা দেখে মনে হলো, তারা আমার ভার্শিটিরই ছাত্রী। কিন্তু তাদের খাওয়ার ধরন দেখে মনে হলো, তারা অভিজাত কোনও পরিবার থেকে এসেছে।

আমি অনুমতি নিয়ে বসে পড়লাম। খাবারের অর্ডার করে চুপচাপ অপেক্ষা করছি। খাবার এল। আমি আমাদের আলজেরিয়ার রীতি অনুযায়ী, হাতা গুটিয়ে হাত দিয়েই খেতে শুরু করলাম। লক্ষ্য করলাম মেয়ে দু'টো আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারলাম, আমার হাত দিয়ে খাওয়াটা তারা মেনে নিতে পারছে না। একজন ফস প্রশ্ন করে ফেললো:

-তুমি সবার মতো চামচ ব্যবহার করছো না কেন? হাত দিয়ে খেতে তোমার ঘেন্না লাগছে না?

আমি মুখের খাবারটুকু গিলে আত্মবিশ্বাসের সাথে বললাম:

-চামচ বানানো হয়েছে যাদের হাত ময়লা তাদের জন্যে। আমি আমার হাত সব সময় পরিষ্কার রাখি। দিনে কমপক্ষে পাঁচবার ধুই।

তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করি:

-চামচ দিয়ে খাবার খাওয়ার প্রচলন কে করেছে সেটা জান?

-জ্বি না। আমরা তো ছোটবেলা থেকেই চামচ দিয়ে খেয়ে আসছি।

-তাহলে শোন! চামচ দিয়ে খাওয়ার প্রচলন কিন্তু একজন মুসলিমের করা।

-এটা তো অবিশ্বাস্য! কে তিনি?

-তিনি হলেন আমার মতোই একজন কালো মানুষ। মুসলিম বিজ্ঞানী-সংগীতজ্ঞ-ফ্যাশন বিশেষজ্ঞ 'যিরযাব'। তিনিই বাগদাদ থেকে স্পেনে এসে, খলীফা আব্দুর রাহমান (২য়)-এর দরবারে এ রীতির উদ্ভব ঘটান।

# সভ্যতার বিকাশে মুসলিমদের অবদানঃ

## প্রেক্ষিত ফ্যাশন

জাইরাব ছিলেন নবম শতাব্দীর একজন মুসলিম ফ্যাশন আইকন। তিনি বাগদাদ থেকে কর্ডোভায় আসেন। লেখক জেসন ওয়েবস্টার (Jason Webster) তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন - “তিনি তার সাথে করে সব ফ্যাশন নিয়ে আসেন। বাগদাদ ছিল সে সময়ের প্যারিস এবং নিউইয়র্ক এবং..... সে সময় আধুনিক ধ্যান ধারণার প্রবাহ ছিল বাগদাদ থেকে কর্ডোভার দিকে। তিনি তার সাথে করে (বাগদাদ থেকে) আনলেন টুথপেস্ট, ডিওড্রেন্ট, এবং ছোট চুল।.....এটাই হল বাস্তবতা; কর্ডোভায় স্থাপিত হল রাস্তার বাতি, আবজনা-পরিশোধন কেন্দ্র, বহমান জলাধার”।

ইরাকের বাগদাদ ছিল সে সময়ের সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার কেন্দ্র। জাইরাব সেখান থেকে তৈজসপত্র (tableware) এবং সেলাই করা কাপড়ের ফ্যাশন নিয়ে আসলেন। এমনকি কর্ডোভায় দাবা এবং পোলোর মত খেলার প্রচলনও তারই হাত দিয়ে হয়। এছাড়াও তিনি বাগদাদ থেকে নিয়ে আসেন চামড়ার তৈরি বিভিন্ন আসবাব পত্র।

তার সূক্ষ্ম ফ্যাশনশৈলী দিয়ে তিনি সে সময়ের খলিফার রাজ দরবার ডিজাইন এবং নির্মাণ করেন। কর্ডোভার সাধারণ লোকেদের কাছে তার ছোট চুলের ফ্যাশন জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ফ্রেঞ্চ ঐতিহাসিক হেনরি ট্যারেস (Henry Terrace) জাইরাবের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি কর্ডোভায় গরম এবং শীতকালের জন্য আলাদা পোশাকের প্রবর্তন করেন। সেই সাথে কোন পোশাক কবে থেকে ব্যবহার করা সবচেয়ে উপযোগী তিনি সে ব্যাপারে দিন তারিখ নির্ধারণ করেন। এ ছাড়াও তিনি এই দুই ঋতুর পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ের জন্যেও বিশেষ পোশাক ডিজাইন করেন। তার মাধ্যমে স্পেন এ প্রাচ্যের বিলাসবহুল পোশাকের আগমন ঘটে। তার হাত ধরেই গড়ে উঠে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি যেখানে সে সময়ের সবচেয়ে বিলাসবহুল এবং চমকপ্রদ পোশাক তৈরি হত। জাইরাবের অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার নামে তৈরি হয় সড়ক, হোটেল এবং ক্যাফে।

এরপর ধীরে ধীরে আন্দালুসিয়ার মুসলিমরা বিভিন্ন ঋতুর জন্য আরামদায়ক লাইফস্টাইল গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। তারা বছরের বিভিন্ন সময়ের জন্য উপযোগী খাবার ও পোশাকের ঐতিহ্য গড়ে তুলে। তারা শীতকালে ব্যবহারের জন্য গাঢ় রঙের উলের তৈরি পোশাক এবং গরম কালে ব্যবহারের জন্য সুতা ও সিল্কের তৈরি হালকা কাপড়ের পোশাকের প্রচলন করে।

আন্দালুসিয়ার মুসলিমরা রোমানদের কাছ থেকে ওক গাছের সোল নির্মিত জুতা তৈরির কৌশল রপ্ত করেছিল। তারা রোমানদের কাছ থেকে লব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করে গবেষণা করতে থাকে এবং এ জুতার শৈল্পিক মানের বিকাশ ঘটায়। এক সময় এ জুতা তারা বিদেশেও রপ্তানি করতে থাকে। আল সাকাতি এবং ইবন আদ্বনের মত মুসলিম লেখকদের বিবরণীতে ওক কর্ক-সোল জুতা

নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। হালের ব্যবহৃত জনপ্রিয় হাই-হিল জুতা তৈরির কলা কৌশলও উক্ত লেখকদ্বয়ের লেখায় পাওয়া যায়।

তাই এরপর যখন আপনি কোন সিজনাল কাপড়, বিশেষ হেয়ার কাট কিংবা ফ্যাশনেবল জুতা কিনতে যাবেন সে সময় জাইরাবের ক্রিয়েটিভ মুসলিমদের কথা চিন্তা করে গর্বিত হতেই পারেন ! (সংগৃহিত)

alammin5g

## এক চুমুকে ইতিহাস: ১২৮

আতিক উল্লাহ

আমাদের কর্ডোভা:

স্বর্ণযুগে আমাদের কর্ডোভার জনসংখ্যা ছিল এক মিলিয়ন (দশলাখ)।

বড় বড় প্রাসাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তারমধ্যে দশটাই ছিল রাজকীয়।

এগার লক্ষ ত্রিশ হাজার ঘর।

সাতশ মসজিদ।

নয়শ গণগোসলখানা।

তেতাল্লিশ হাজার ছোট হাট।

পাঁচ হাজার বাজার মাড়াইঘর।

তাদের কর্ডোভা:

ছোট আটপৌরে একটা শহর। জনসংখ্যা লাখখানেক। আগের তুলনায় অনুন্নত।

alaminn5g



এক চুমুকে ইতিহাস: ২৭৭

যাহরা প্রাসাদ! কর্ডোভা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আন্দালুসের অষ্টম উমাইয়া খলীফা আবদুর রহমান নাসির রহ. (৮৯১-৯৬১) এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদটা ছিল হুবহু দামেশকের রাজপ্রাসাদের আদলে তৈরী। এমনকি গাছপালাও দামেশক থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাপ-দাদার স্মৃতি ভুলতে পারেননি তারা। আব্বাসীদের ভয়ে সমুদ্র পার হতে না পারলেও, সেখানে আরেকটা দিমাশক গড়েপিটে নিতে চেয়েছিলেন হয়তো বা! ছবির ইয়াসমীন ফুলগুলোও খলীফা নাসিরের আমলে লাগানো। আজো সেই স্মৃতি বহন করছে ! ফুল আছে কিন্তু বাগানের মালিরা আজ অনুপস্থিত ! -আতিক উল্লাহ



এক চুমুকে ইতিহাস: ২৭১

হিজরী ৮৬ সাল। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান মৃত্যুশয্যা শায়িত। চারপাশে আত্মীয়-স্বজন ঘিরে আছে। তার খিলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। চারদিকে আরবদের জয়জয়কার। পুরো বিশ্বের চারদিকে মুসলিম সেনাপতিরা ছড়িয়ে পড়েছিল। পাশে ছিল বড়ছেলে ওলীদ বিন আবদুল মালিক। তার কান্ভেজা চেহারা দেখে, বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন:

-তুমি কাঁদছ? তোমার মতো মানুষের পক্ষে কাঁদা শোভা পায় না। তুমি হবে শক্ত-সমর্থ পুরুষ! অনড়-অবিচল! তুমি আমার সাথে ওয়াদা করো, আমার শুরু করা বিজয়ের ধারাকে অব্যাহত রাখবে।

-আমি ওয়াদা করলাম! ইয়া আমীরাল মুমিনীন!

-  
বাবার সাথে করা ওয়াদা ওলীদ বিন আবদুল মালিক ঠিকই পূরণ করেছিলেন। তার আমলই ছিল মুসলিম বিজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়গুলোর একটি। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পূর্বে চীনে আর পশ্চিমে আন্দালুসে গিয়ে ঠেকেছিল।

তার আমলে মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহ. সিন্ধু জয় করেছিলেন।

কুতাইবা বিন মুসলিম প্রায় পুরো মধ্য এশিয়া জয় করেছিলেন।

মুসা বিন নুসাইর ও তারেক বিন যিয়াদ পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেন জয় করেছিলেন।

**-আতিক উল্লাহ**



অতীত জানি, পাথেয় আনি (ইসলামের ইতিহাস):

ইতিহাসে এই দিন: ১৩ সেপ্টেম্বর

--

১: স্পেন ও পর্তুগালের রাজা ফিলিপ (২য়) মারা যায় (১৫৯৮)। তার পুরো জীবনটা কেটেছিল খ্রিস্টরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ও মুসলিম নিধনে। তার পিতা ছিল সম্রাট শার্লোকা। পঞ্চম ফার্নান্দো ও প্রথম ইসাবেলার নাতি। স্পেনে তার শাসনকাল ছিল ১৫৫৬-১৫৯৮। পর্তুগালে তার শাসনকাল ছিল ১৫৮০-১৫৯৮।

তার আমলে, মুসলিম নিধন চরম আকার ধারণ করে। রাজা ফিলিপ মুসলিম দমনে অসংখ্য ডিক্রি জারী করে:

এক: মুসলিমরা কোনও অস্ত্র বহন করতে পারবে না।

দুই: মরিস্ক (স্পেনিশ মুসলিম) আরবী ভাষায় কথা বলতে পারবে না।

তিন: মরিস্করা আরবীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে পারবে না।

চার: হাম্মাম ব্যবহার ও গোসল করতে পারবে না। সমস্ত হাম্মাম (গোসলখানাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছিল)।

পাঁচ: মুসলিম রীতিতে আনন্দ প্রকাশ করা যাবে না।

ছয়: মুসলিম নারীরা হিজাব ব্যবহার করতে পারবে না।

সাত: দাড়িতে খেজাব-মেহেদি লাগানো যাবে না।

আট: আরবী নাম ও পদবি ব্যবহার করা যাবে না।

এছাড়াও:

নয়: ফিলিপ মরিস্কদের দ্বারা সংগঠিত বাশারাত বিপ্লবকে অমানুষিক নির্মমতায় দমন করে।

**-আতিক উল্লাহ**

দিনলিপি-৮৯

(১১-০১-২০১৫)

প্রপাগান্ডা!

-

\*\*\* আমরা যারা সাধারণ পর্যায়ের চিন্তক, গড়পড়তা মানুষ, তারা পরিণত বয়সের একজন ভাল মানুষ দেখলে, অনেক সময় মনে মনে ভাবি, এই লোকটা নিশ্চয়ই যৌবনে অনেক কিছুই করেছে। না হলে এত ভাল হওয়ার তো কথা নয়।

\*\*\* এটা কোনও সুস্থ চিন্তা নয় যে, ভাল হওয়ার আগে মন্দ হতেই হবে। এসব হলো আমার মতো দুষ্কদের চিন্তা। এটুকু হলেও চলতো। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়। ‘আল গায়বুল ফিকরি’ বা চৈতনিক আগ্রসনের কুফলসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে তারা এই চিন্তাটা আমাদের মানসে বসিয়ে দিয়েছে যে, ভালর আগে মন্দ থাকবেই থাকবে।

\*\*\* প্রাচ্যবিদরা এটাকে আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। ইতিহাসের নিরপেক্ষ-নির্মোহ পাঠের নামে তারা সাহায্যে কেরামকেও ছাড়েনি। এমনকি নবীজিকেও (সা.) ছাড়েনি।

\*\*\* রাবেয়া আল আদাবিয়াহ বা রাবেয়া বসরি (রহ.)। তিনি মুসলিমদের কাছে একজন আল্লাহর খাস বান্দী হিসেবে পরিচিত। তিনি আজীবন আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা জীবন কাটিয়ে গেছেন। এজন্য বিয়ের কথাও ভাবার সুযোগ পাননি। অথচ তার কাছে অনেক বড় বড় ব্যক্তিরও প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন।

\*\*\* তার মাধ্যমেই সুফিবাদের একটা ধারা, ‘ইশকে ইলাহি’র প্রবর্তন ঘটে।

\*\*\* তিনি ছেলেবেলাতেই (বয়েস দশ হওয়ার আগেই) মা-বাবাকে হারিয়ে পুরোপুরি ইয়াতীম হয়ে যান। তিনি ১০০ হিজরির মানুষ। ৭৭২ ইসাযী। তিনি ছিলেন বাবা মায়ের চতুর্থ সন্তান তাই তার নাম হয় রাবেয়া। তিনি বসরার অধিবাসী।

\*\*\* মুসলিম বিশ্বে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এগিয়ে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে মিসর। আর মুক্ত চিন্তায় এগিয়ে আছে তিউনিস। পশ্চাত্য চিন্তার ধারকবাহক হলেও, চলচ্চিত্রের গুণগত মানের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে মিসর এখনো অনেক পিছিয়ে। তাদের চলচ্চিত্র পুরোটাই অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট। সে তুলনায় তুরস্ক ও সিরিয়া চলচ্চিত্র শিল্পে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। মুসলিম ইতিহাসনির্ভর চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ইরানের পরেই সিরিয়ার স্থান। তার অনেক পরে আছে তুরস্ক।

\*\*\* অবশ্য সংখ্যার বিচারে মিসরেই ইসলামের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের বিকৃতিও হয়েছে বেশি। ইরান ও সিরিয়া শিয়া। তাদের শিয়া মতবাদই

তারা প্রচার করবে। সেটা তারা করেও। তাদের চলচ্চিত্রেই সেটা বেশ ভালভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু মিসর শিয়াদের চেয়েও মারাত্মক মতবাদ দ্বারা আক্রান্ত।

\*\*\* মিসরের শিল্প-সাহিত্য-সাংবাদিকতা-চলচ্চিত্র সবকিছুতেই প্রাচ্যবিদদের প্রবল আধিপত্য। আর প্রাচ্যবিদদের নাকে দড়ি বেঁধে ঘোরাই ইহুদিরা। মিসরে শুরু থেকেই, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর পেছনে ইহুদিরা জায়গা করে নিয়েছে। তারা কলকাঠি নাড়ে। জল পড়ে পাতা নড়ে।

\*\*\* রাবেয়া বসরীকে নিয়ে একটা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে মিসরে। সেটাতে পরিচালক দেখানোর চেষ্টা করেছেন, রাবেয়া বসরী প্রথম জীবনে খুবই উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছেন। শেষ জীবনে এসে ভাল হয়েছেন। আর মানুষ এটা দেখে বিশ্বাসও করছে। এর আগে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) কে নিয়েও তারা বেশ কয়েকটা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে। সেখানেও তারা এই মূলনীতি মানতে কসুর করেনি: তুমি এখন ভাল, তার মানে আগে খারাপ ছিলে।

\*\*\* বর্তমানে ইওরোপিয়ান সিভিলাইজেশন প্রচারের মূল স্তম্ভই হলো চলচ্চিত্র। হলিউড। যেমনটা ভারতীয় আগ্রাসনের অন্যতম স্তম্ভ হলো বলিউড।

\*\*\* পুরো চলচ্চিত্র শিল্পটাকেই কিছু মতবাদের ফ্রেমে বন্দী করে রেখেছে তারা। এই ফ্রেমের মধ্য দিয়েই পুরো বিশ্বে তাদের মতবাদ প্রচার হয়। এই ফ্রেমের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। তাহলে যে অস্কার, গ্র্যামি এওয়ার্ড ইত্যাদিতে মনোনয়ন পাওয়া যাবে না। জাতে ওঠা যাবে না!

\*\*\* এই নিগড় ভাঙ্গা সহজে সম্ভব হবে না। কারণ এই ফ্রেমের বাইরে দিয়ে কেউ খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি। সুবিধা করতে দেয়া হয়নি। টুটি চেপে মেরে ফেলা হয়েছে।

-আতিক উল্লাহ

“সাকরু কুরাইশ” কুরাইশ গোত্রের বাজপাখি।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিল (১১৩-১৭২হি) (৭৩১-৭৮৮খৃ)

কুরাইশ গোত্রীয় ছিলেন। আন্দালুসে তাঁর দূরদর্শী ও চৌকশ পদক্ষেপে মুগ্ধ হয়ে আবু জাফর আল-মানসুর তাঁকে “সাকরু কুরাইশ” কুরাইশদের বাজপাখি উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৩২ হিজরীতে আব্বাসীদের হাতে দামেস্কে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন হলে তিনি আন্দালুসে এসে পাড়ি জমান। উমাইয়া খেলাফতের তিনিই প্রথম খলিফা, যিনি আন্দালুসের মাটিতে প্রথম পদার্পন করেন। তাই তাকে “আদ-দাখিল” বলা হয়।

আন্দালুসে তিনি খেলাফতে উমাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। যখন আন্দালুসে আগমন করেন, তখন তা বিদ্রোহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার কবলে জর্জরিত। কিন্তু তিনি সে আন্দালুসকে স্থিতিশীল ও শান্তির ফিরদাওসে রূপান্তরিত করেন।

alaminn5g

#তারেক বিন যিয়াদ রহ কর্তৃক মুসলিম সৈন্যবাহিনীর জাহাজ পুড়িয়ে দেয়া!#বাস্তবতা কতটুকু?

ইসলামি ইতিহাসে একটি ঘটনা ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা হলো আন্দালুসের বিজয়ী তারেক বিন যিয়াদ কর্তৃক মুসলিম সৈন্যবাহিনীর জাহাজগুলো পুড়িয়ে দেয়া যেন কেউ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের সুযোগ না পায়।

কিন্তু বিষয়টিকে যদি গভীর দৃষ্টিতে যাচাই করা হয়, তবেই বুঝা যাবে যে ঘটনাটি প্রমাণিত নয়; বরং ইউরোপীয়ান ইতিহাসবেত্তাদের বানানো মনগড়া কাহিনী! ইতিহাসবিদদের কেউ ঘটনাটিকে বাস্তব মনে করেন আর কেউ মনে করেন তা অসত্য। আর অসত্য ও অবাস্তব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ঘটনাটি প্রমাণিত ও সত্য না হওয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ:

#১. আমরা সকলেই জানি কোনো বর্ণনা সহিহ হতে গেলে তার সনদ সহিহ হতে হয়। চাই তা হাদিসের বর্ণনা হোক বা ইতিহাসের কোনো বর্ণনা হোক। উক্ত ঘটনাটি মুসলিম ঐতিহাসিকদের কোনো নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। বরং তা আমাদের কাছে ইউরোপীয়ান ইতিহাসগ্রন্থগুলোর মাধ্যমে পৌঁছেছে।

#২. উক্ত জাহাজগুলো মূলত তৈরী করেছিলেন মুসা বিন নুসাইর রহ.। আর তারেক বিন যিয়াদ রহ.কে আন্দালুস অভিযানে পাঠিয়েছিলেনও তিনি। যদি বাস্তবেই জাহাজ পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাটি ঘটত, তাহলে পুড়িয়ে দেয়ার কারণে অবশ্যই তারেক বিন যিয়াদকে মুসা বিন নুসাইর বা তৎকালীন খলিফা ওলীদ ইবনে আব্দুল মালিকের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। তারা এই পুড়িয়ে দেয়ার কারণ সম্পর্কে অবশ্যই তাকে জিজ্ঞাসা করতেন। অথচ যেসমস্ত ইতিহাসগ্রন্থে এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, তাতে এই জবাবদিহিতা সম্পর্কে কিছুই লেখা হয়নি। দ্বিতীয়ত জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনা না ঘটলেও মুসলিম সেনাপ্রধানের পক্ষ থেকে এরকম জাহাজ পুড়িয়ে দেয়া বৈধ না অবৈধ, এ নিয়ে অবশ্যই উলামায়ে ইসলাম কোনো না কোনো আলোচনা করতেন। কিন্তু ইতিহাসগ্রন্থগুলো ঘটলে দেখা যায় এ ধরনের কোনো আলোচনাও পূর্বকার উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে পাওয়া যায় না। তাই এ দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে উক্ত ঘটনাটির শুদ্ধতার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

#৩. ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকরা তাদের রচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এই ঘটনা বর্ণনার মূল রহস্য হলো, তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা এবং মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানে বিজয়লাভের আসল কারণ সম্পর্কে জানতে না পারা। তারা ভেবেছে মাত্র বারো হাজারের বাহিনী রডারিকের একলক্ষ সৈন্যের বাহিনীর বিরুদ্ধে কীভাবে বিজয় লাভ করল? অথচ রডারিকের বাহিনীর সকলেই ছিল অশ্বারোহী, ছিল পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত, প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের সরঞ্জাম তাদের কাছে মজুদ ছিল। আবার যুদ্ধও সজ্জাটিত হয়েছিল তাদের নিজেদের দেশে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের প্রায় সকলেই ছিল পদাতিক, অস্ত্রসজ্জাও তেমন ছিল না। এই অস্বাভাবিক বিজয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তারা লিখল, মুসলমানরা যেন খ্রীষ্টানদের এত বড় বাহিনী দেখে ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন না

করে তাই তারিক বিন যিয়াদ তাদের জাহাজগুলোকে পুড়িয়ে দেন। কেননা এই পোড়ানোর ফলে মুসলমানদের সামনে মাত্র দু'টি পথই খোলা থাকবে, হয়তো সমুদ্র ঝাপ দিবে আর না হয় খ্রীষ্টানদের এই বিরাট বাহিনীর হাতে নিজেরা ধ্বংস হবে। আর উভয় পথেই নিশ্চিত মরণ। তাই তারিক বিন যিয়াদ এমন পন্থা অবলম্বন করলেন যেন মুসলমানরা কোনো উপায় না দেখে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কারণ কেউ যখন দেখে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পথ নেই তখন সে খুব জোরালোভাবে আক্রমণ করে। সুতরাং তাই হলো, আর এরই ধারাবাহিকতায় মুসলমানরা বিজয়লাভ করল! অন্যথায় যদি মুসলমানদের জাহাজগুলো বাকি থাকত তাহলে তারা কোনোক্রমেই যুদ্ধে রত হত না, বরং জাহাজে করে নিজেদের দেশে ফিরে যেত!

এই ধারণার ভিত্তিতেই তারা নিজেদের রচনাগুলোতে এই কাহিনীর অবতারণা ঘটায়। কারণ তারা তো এই বস্তুজগত ছাড়া আর কিছুই বুঝে না! আল্লাহর এই অমোঘ বিধান, *غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ*, (249) এমন কত ছোট দলই না রয়েছে যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে! (বাকারা: ২৫০) সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ।

ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা সকলেই জানে মুসলমান কখনো সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে যুদ্ধে বিজয় লাভ করে না। বরঞ্চ এমন হয়েছে যে, সংখ্যাধিক্যের উপর ভরসার বিন্দুমাত্র চিন্তা করার কারণে তাদের পরাজিত হতে হয়েছে! হুনাইনের যুদ্ধ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

#৪. মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানে অটল-অবিচল রাখার জন্য এই জাহাজ পুড়িয়ে দেয়ার কী প্রয়োজন! স্বল্পসংখ্যক মুসলমান বহুসংখ্যক কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো আর একবার করেনি, বহুবার করেছে! তো সেখানে কিসের মাধ্যমে তাদের অবিচলতা স্থির থাকত? আসল কথা হলো মুসলমান কখনো বাহ্যিক উপায় উপকরণের ওপর ভরসা করে জিহাদের ময়দানে লড়াই করে না। বরং তাঁরা শাহাদাতের তামান্না নিয়েই জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয়। তাই এই জাহাজ পুড়িয়ে দিয়ে অবিচলতা ধরে রাখা অন্যদের জন্য হলেও অন্তত মুসলমানদের ক্ষেত্রে এর কোনো প্রয়োজন নেই।

#৫. তারিক বিন যিয়াদ রহ. এর মতো একজন দক্ষ ও বিচক্ষণ সেনাপতির থেকে কখনো এমন কাজের আশা করা যায় না। কারণ আল্লাহ না করুন যদি মুসলমানরা পরাজয় বরণ করত! আর তা অসম্ভবও না! তাহলে কি অবস্থা হতো?! দ্বিতীয়ত যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে যাওয়া মানেই তো দুষণীয় না! কারণ আল্লাহ বলেন,

*إِلَىٰ فِتْنَةٍ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مَتَحَيِّرًا كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُؤَلِّمُ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ (وَبَيْسَ الْمَصِيرُ) 16 فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ*

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। তবে কেউ যদি যুদ্ধ কৌশল হিসেবে এ রকম করে অথবা সে নিজ দলের সাথে গিয়ে মিলতে চায়, তার কথা আলাদা...। (আল আনফাল: ১৫-১৬।)



সুতরাং এই সম্ভাবনাও তো ছিল যে, মুসলমানরা কোনো নতুন কৌশল হিসেবে বা অন্য কোনো দলের সাথে মিলে একযোগে আক্রমণ করার জন্য সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন হতো! তখন তারিক বিন যিয়াদ কী করতেন? এটাতো কোনোভাবেই শরিয়ত অনুমোদন দেয় না! আর এমন একটি শরিয়ত বহির্ভূত কাজ তারিক বিন যিয়াদের পক্ষ থেকে হওয়া মোটেও সম্ভব না। আর যদি তা হয়েও থাকত তাহলে উম্মাহর উলামায়ে কেরাম অবশ্যই এ নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু কোথাও এমন কোনো আলোচনা বর্ণিত হয়নি।

#৬. ঐ জাহাজগুলোর সব মুসলমানদের ছিল না। বরং কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সাবতার রাজা জুলিয়ানও কিছু জাহাজ ভাড়া দেয়ার শর্তে দিয়েছিল। তো তারিক বিন যিয়াদ যদি জাহাজ পুড়িয়ে দিতেন তাহলে নিজেদেরগুলো না পুড়তে পারতেন কিন্তু তাদের জাহাজ কীভাবে পুড়তেন? সে অধিকারতো তার ছিল না।

##মোটকথা তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক জাহাজ পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা। কাহিনীটি বানানোই হয়েছে মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়কে খাটো করে দেখানোর জন্য।  
--ডক্টর রাগেব সারজানি লিখিত "قصة الأندلس" এর ভাব অবলম্বনে।

alamini5g

দিনলিপি-৩২৬

(২৩-০৯-২০১৫)

টেরোরিস্ট বনাম ইরহাবী!

(এক):

মক্কা বিজয় হলো। নবিজী (সা.) এবার প্রবেশ করছেন। একটা চমৎকার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, তিনি উটের পিঠে সওয়ার। বিনয়ে মাথাটা একদম নুয়ে আছে। পাগড়ীর ‘গাছা’টা প্রায় উটের পিঠের সাথে লেগে যাওয়ার উপক্রম।

তিনি মক্কাবাসীকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

-আমি আপনাদের সাথে কেমন আচরন করবো বলে ধারণা করেন?

-আমাদের একজন মহৎহৃদয় ভাই, একজন উদারহৃদয় ভাতিজাই মনে করি আপনি!

-ঠিক আছে, আপনারা সবাই আজ মুক্ত। স্বাধীন।

একজন বিজেতা আচরণ যদি এমন হয়, তাকে কোনও ভাবে সন্ত্রাসী ধর্মের প্রবক্তা-উদগাতা আখ্যা দেয়া যায়?

তিনি প্রেরিত প্রতিনিধি দলের নেতাদেরকে বলেছিলেন:

-তোমরা লড়াই করো, বাড়াবাড়ি-সীমালঙ্ঘন করো না। গাদ্দারি-বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

অহেতুক অঙ্গহানি করো না। শিশু হত্যা করো না।

এমন মানুষকে বুঝি সন্ত্রাসী ধর্মের উদ্যোক্তা বলা যায় ?

(দুই):

প্রথম খলীফা আবু বাকর (রা.)। তিনি দায়িত্ব নিয়েই প্রথমবারের মতো অভিযানে পাঠাচ্ছেন ওসামা বিন যায়েদকে, সিরিয়ার দিকে। বিদায় বেলায় দিলেন দশটা ওসিয়ত:

ক: নারীদের হত্যা করবে না।

খ: শিশুদের হত্যা করবে না।

গ: বয়োবৃদ্ধদেরকে হত্যা করবে না।

ঘ: ফলদার বৃক্ষ কর্তন করবে না।

ঙ: বসতিপূর্ণ জনপদকে ধ্বংস করবে না।

চ-ছ: খাবারের প্রয়োজন ছাড়া ছাগল-উট বধ করবে না।

জ: খেজুর গাজ জ্বালিয়ে দেবে না।

ঝ: ধোঁকা দেবে না।

ঞ: কাপুরুষতা করবে না।

এত সুন্দর মানবিক উপদেশ বিশ্ব-ইতিহাসে কোনও জেনারেলকে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান দিয়েছে

কখনো? দেখাতে পারবে কেউ? অন্য কেউ দিয়ে থাকলে, তাকেও সন্ত্রাসবাদী বলা হবে?

(তিন):

ইসলাম বড় বড় বিজয়ের পরও, আচরণে ছিল দয়া ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। মুজাহিদগন জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্যে তলোয়ার হাতে নেন নি। দ্বীনের দাওয়াত, এক আল্লাহর নাম বুলন্দ করার দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করতেই তরবারি ব্যবহার করেছেন। তাওহীদের দাওয়াতের পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যেই শুধু তরবারি ব্যবহার করেছেন। যেখানে দাওয়াত -তাবলীগ বাধাগ্রস্ত হয়নি সেখানে তরবারি ব্যবহৃত হয়নি।

ফরাসী ঐতিহাসিক গুস্তাভ লেবুন বলেছেন:

-বিশ্ব ইতিহাসে আরবদের চেয়ে দয়ালু বিজেতা আর দেখা যায় নি।

টমাস আরনল্ড তার প্রিচিং অব ইসলাম বইয়ে লিখেছেন:

-মুসলমানরা বিজিত এলাকায় কেমন ন্যায়ানুগ আচরণ করতো?

= মুসলিম বাহিনী জর্দানে পৌঁছল। সেনাপতি আবু ওবায়দা (রা.) একটা চিঠি পেলেন।

সেখানকার খ্রিস্টানরা লিখেছে

-আপনারা আমাদের কাছে রোমকদের চেয়েও বেশি প্রিয়। তারা আমাদের ধর্মের লোক সত্য, কিন্তু তাদের তুলনায় আপনার বেশি ওয়াদ রক্ষাকারী। আমাদের প্রতি বেশি দয়ালু। আপনারাই তাদের চেয়ে বেশি রক্ষাকারী। তাদের চেয়ে ভাল শাসক। তারা আমাদের দেশ জয় করেছিল। আপনারা আমাদের হৃদয় জয় করেছেন।

এটাই হলো ইসলাম। দয়া ও ন্যায়ের প্রতীক।

আর ইউরোপ? তাদের আচরণ কেমন ছিল? একটু দেখা যাক।

(চার):

১: পোপ দ্বিতীয় আরবান মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক 'পবিত্র' যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। পুরো ইউরোপকে ঘোষণা দিয়েছেন, মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমূল করতে হবে। এ-যুদ্ধ চলেছিল দুইশত বছর ধরে।

= এটা সন্ত্রাস নয়তো কোনটা?

২: পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ড। তিনি আন্দালুসের শেষ সুলতান আবু আবদুল্লাহর সাথে স্বাক্ষর করা সমস্ত চুক্তি ভঙ্গ করে, সেখানকার মুসলমানদের ওপর চালিয়েছিলেন নির্যাতনের স্টীম রোলার। হালাল ঘোষণা করেছিলেন তাদের রক্তকে। জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

গুস্তাভ লেবুন লিখেছেন:

-১৬১০ সালে যখন আরবদেরকে স্পেন থেকে নির্বাসিত করার ব্যবস্থা হলো, মুসলমানদেরকে হত্যা করার যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। প্রায় তিন মিলিয়ন (ত্রিশ লাখ) মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল।

= এটাকে কী বলবো? সভ্যতা? নাকি সন্ত্রাস?

অথচ মুসলামানরা যখন স্পেনে প্রবেশ করেছিল, সেখানকার অধিবাসীদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। তারা তাদের ধর্ম পালন করতো নিজের মতো করে। তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো। তাদেরকে শুধু সামান্য পরিমাণে জিযিয়া আদায় করতে হতো। তারা আগের গথিক রাজাদেরকে যে পরিমাণ বার্ষিক কর দিত তার চেয়েও কম।

জার্মান গবেষক সেগরেড হোঙ্কা লিখেছেন:

-স্পেনে আরবদের ন্যায়পরায়নতা এত উচ্চমাত্রায় পৌঁছেছিল, বর্তমানের মানুষগুলো কল্পনাও করতে পারবে না।

তিনি আরও লিখেছেন:

-লা ইকরাহা ফিদীন। ধর্মে কোনও জোর-জবরদস্তি নেই। এটা শুধু কথার কথা নয়। ইসলামে এটা একটা অবশ্য পালনীয় সংবিধান। এই আয়াতের লক্ষ্যমাত্রা জোর করে ইসলাম প্রচার বা বিশ্বজুড়ে আরবদের বিজয়ডঙ্কা ওড়ানো ছিল না। এটার লক্ষ্যমাত্রা ছিল পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা।

মুসলিম রাষ্ট্রে একজন খ্রিস্টান তার ধর্মেই থেকে যেতে পারতো। একজন ইহুদি তার ধর্মে থেকে যেতে পারতো। যেমনটা সে আগে ছিল। কেউ তাকে তার ধর্ম পালনে বাধা দিতো না। কেউ তাদের ধর্মগুরুদের অসম্মান করতো না। কেউ তাদের ধর্মালয়ের সম্মানহানি করতো না।

= এটাই কি সন্ত্রাস?

= প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কারা লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে ?

= হিরোশিমা-নাগাসাকিতে কারা আণবিক বোমা ফেলেছে?

= কারা স্পেনের লাইব্রেরীগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ?

= কারা বাগদাদের কিতাব দিয়ে দিজলা-ফোরাতে পানি কালো করে ফেলেছিল?

= কারা স্পেনে ইনকুইজিশনের মাধ্যমে লাখো মানুষকে খ্রিস্টান বানিয়েছিল ?

= কারা নতুন বিশ্বে (আমেরিকায়) লাখো রেড ইন্ডিয়ানকে একেবারে নির্মূল করে দিয়েছিল ?

= কারা আলজেরিয়াতে দুই মিলিয়ন মুসলমানকে শহীদ করেছিল ?

= কারা বর্বর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে বসনিয়ার সেব্রেনিৎসায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর পরিমাণ তিনভাগের একভাগে কমিয়ে এনেছিল?

= সোভিয়েত ইউনিয়ন কতো কতো মানুষকে হত্যা করেছিল ? কমিউনিষ্ট সোভিয়েতের অপরাধের কথা কি কারো মনে নেই?

= যুগোস্লাভিয়ার একনায়ক মার্শাল টিটোর বর্বরতম অপরাধের কথা কি মনে নেই ?

= হালাকু খাঁর কথা কি মনে নেই?

= চেঙ্গিস খাঁর কথা মনে নেই?

= বায়তুল মুকাদ্দাস দখলের সময় খ্রিস্টানদের গণহত্যার কথা মনে নেই ? পোপের আদেশেই তো সেটা ঘটেছে?

= স্পেনের বারবাসতারের গণহত্যা, মা'আররা নু'মানের গণহত্যা, সাবরা-শাতীলার গণহত্যা, দেব ইয়াসীনের গণহত্যা কথাও কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলো?

= ল্যাটিন আমেরিকার মায়া-এ্যাজটেক-ইনকা সভ্যতার কথা ভুলে গেলে চলবে? এই তিনটা সভ্যতাকে করা ধ্বংস করেছে? কারা এখানকার অধিবাসীদেরকে হত্যা করেছে?

=কোনও ইহুদি বা খ্রিস্টান কি কখনো নিজেদের ধর্মের কোনও দলকে সন্ত্রাসী বলেছে?

= তাদের কেউ কি কখনো বলেছে, মধ্যযুগের নাইটরা সন্ত্রাসী?

এভাবে প্রশ্ন করতে থাকলে, ইহুজীবনেও মানবতার বিরুদ্ধে অমুসলিমদের বর্বরতার কাহিনী ফুরোবে না।

কিন্তু অদ্ভুতভাবেই তারা, সব সময় মুসলমানদের দিকেই অভিযোগের আঙুল ওঠায়।

সাধারণ মানুষ ও অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের এই প্রচারণাকে বিশ্বাসও করে। কিছু জ্ঞানপাপী আবার জেনেশুনেও বিশ্বাস কর বা ভান করে।

ইতিহাস স্বাক্ষী। কুরআন স্বাক্ষী। হাদীস স্বাক্ষী। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক স্বাক্ষী:

= ইসলাম কখনোই অশান্তির ধর্ম ছিল না। ইসলাম ছিল শান্তি-দয়া-ইনসাফের ধর্ম।

আর সন্ত্রাস বলতে যা বোঝায়, সেটা পাশ্চাত্যের সৃষ্টি। পরবর্তীতে তারা সেটাকে ইসলামের সাথে যোগ করে দেয়।

একটা কথা পরিষ্কার থাকা দরকার:

-কিছু লোক আবার ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে, ইসলামে কোনও যুদ্ধবিগ্রহ নেই। কড়াকড়ি নেই।

-ইসলাম শুধু শান্তির ধর্ম নয়, ক্ষেত্রবিশেষে ইসলাম শান্তির জন্যে ধর্ম।

= কথার পার্থক্যটা প্রাধান্যযোগ্য।

-আতিক উল্লাহ

দিনলিপি-৭৯

(০২-০১-২০১৫)

জুমাবার

\*\*\* গত বছরের আগের বছর। আমরা এই দিনে, আমরা বিশ্বব্যাপী একটা আন্দোলন করেছিলাম:  
= আন্দালুস উদ্ধার আন্দোলন।

\*\*\* আমাদের আন্দোলনের কর্মসূচী ছিলো, সবাই এইদিন আন্দালুস মানে স্পেন নিয়ে কিছু না কিছু লিখব। আমাদের হারানো ফিরদাওস (আল ফিরদাউসুল মাফকুদ) কে নিয়ে স্মৃতিচারণ করবো। কিভাবে আমাদের এই কলিজার টুকরাকে পুনরুদ্ধার করা যায়, চিন্তা-ফিকির করবো।

\*\*\* এই ইভেন্টে সারা বিশ্ব থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। সঙ্গত কারণেই সবাই আরবিতেই স্ট্যাটাস দিয়েছিলো। কमेंট করেছিল।

\*\*\* আমার জন্যে একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটেছিলো। তা হল, আমি শায়খ আলি তানতাভি থেকে ধার করে, স্পেনের জন্যে বিশেষণ হিসেবে ‘আল ফিরদাউসুল মাফকুদ’ বাক্যটা ব্যবহার করেছিলাম। সবাই বাক্যটাকে একদম লুফে নিয়েছিলো। ওরা ভেবেছিলো এটা আমার আবিষ্কার। আমিও আর ভেঙে বলিনি যে, এটা ধার করা। সবার সে কি বাহবা! এখন বুঝতে পারছি, পরের ধনে পোদারি করে কোনও আনন্দ নেই।

\*\*\* এবারও এই ইভেন্টটা হচ্ছে। কিন্তু অতটা ঘট করে নয়। কেমন যেন নির্লিপ্তভাবে। মানুষ বেশিদিন একটা বিষয়ে উৎসাহ ধরে রাখতে পারে না। আমার উৎসাহ কিন্তু সেই আগের মতোই আছে। স্পেন সম্পর্কে জানার পর থেকে, কখনোই স্পেনের কথা ভুলে যাই নি। না না, মৌসুমি স্মরণ নয়, সার্বক্ষণিক স্মরণ।

\*\*\* আমাদের সেই ইভেন্টে বেশির ভাগ মানুষ ছিলো মিসর ও তিউনিসিয়ার। আমি তাদের পড়াশোনা, জানাশোনার পরিধি দেখে অবাক। আর তারা অবাক, বাংলাদেশের মানুষও আরবি জানে!!

\*\*\* ওই ইভেন্টে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিলো, লাইভ ব্রডকাস্ট। অর্থাৎ, স্পেন থেকেই বিভিন্ন মুসলিম স্থাপনাগুলোতে সশরীরে গিয়ে ধারাবর্ণনা দেয়া। তিউনিসিয়ার দুইজন তো শুধু এই ইভেন্ট উপলক্ষে স্পেনে গিয়েছিলো। সেখানে গিয়ে তারা অনেক ভিডিও-অডিও আপলোড করেছিলো। সেসব দেখে ও শুনে সবাই খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিল।

\*\*\* আরও অবাক করা বিষয় হলো, সে দুই জনের একজন ছিলো মেয়ে। মানে জামাই-বউ দুজনেই ঘর-সংসার ফেলে চলে গিয়েছিলো। মেয়েটা কত চটফটে, অথচ পূর্ণ শরয়ী পর্দা মেনেই



এত কিছু করেছে। এই দম্পতির ত্যাগের কারণেই কিনা জানি না, এখন অনলাইনে, বিশেষ করে ফেসবুকে আন্দালুস নিয়ে অনেকগুলো পেজ আছে। পেজগুলো বেশ সক্রিয়ও।

\*\*\* বিশ্বয়ের এখানেই শেষ নয়, সামাহ মানে বউটা ছিলো সন্তানসম্ভবা। ডাক্তার বলেছেন ছেলে হতে পারে। আমরা সবাই প্রস্তাব রাখলাম, ছেলেটার নাম আবদুর রাহমান রাখতে হবে।

\*\*\* এবার একটু কুইজ: আবদুর রহমান কে ছিলেন?

\*\*\* আমাদের নিয়ত আছে, আমাদের মাদরাসায় আল্লাহ তা‘আলা তাওফীক দিলে, নিয়মিত এ ধরনের অনলাইন ইভেন্ট পরিচালনার জন্যে একজন স্বতন্ত্র ‘দায়িত্বশীল’ নিয়োগ দিবো।  
ইনশাআল্লাহ

\*\*\* আজকের এই এই দিনে, স্পেনকে নিয়ে একটা কল্পভ্রমণ-কাহিনী লেখার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু স্পেনের কোনও জায়গার নাম তো জানি না। তাই ‘সন্যাসিনী’ দিয়ে, মাসুদ রানার সাথে একটু স্পেন ঘুরে এলাম। বইটা ফুডুং করে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কোনও ভ্রমণকাহিনী দাঁড়াল না।

**-আতিক উল্লাহ**

একনজরে ইতিহাস (হারানো ফিরদাওস):২

প্রথম ধাপ

আন্দালুসে অভিযান শুরু হয় মূলত ওলীদ বিন আবদুল মালিকের খেলাফতের মাঝামাঝিতে। ৯২ হিজরীতে। ওলীদের খিলাফতকাল ছিলো: ৮৬-৯৬ হিজরী। ৭০৫-৭১৫ খ্রিস্টাব্দ। আন্দালুস বিজয়টা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। বৃহত্তর মাগরিব অঞ্চল ও আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল জয়ের ধারাবাহিকতাতেই আন্দালুস বিজয়ের পালা আসে।

মুসা বিন নুসাইরকে মাগরিব অঞ্চলের ওয়ালি বা গভর্নর নিয়োগ করা হয়। মাগরিব বলতে: মরক্কো-তুনিস-আলজেরিয়াকে বোঝায়। বর্তমানে সুনির্দিষ্টভাবে শুধু মরক্কোকে মাগরিব বলে। আফ্রিকা জয় শেষ। ওপারে ইউরোপ। মুসা খলীফা ওলীদের কাছে অনুমতি চাইলেন। আন্দালুসে অভিযান পরিচালনা করার। খলীফা প্রথমে পরিস্থিতি যাচাই করে দেখতে বললেন। মুসা তখন তরীফ বিন মালিককে পাঠালেন। ৫০০ সেনা দিয়ে। ৯১ হিজরীতে। ৭১০ খ্রিস্টাব্দে। অগ্রগামী অনুসন্ধানী দল অভিযান শেষে ইতিবাচক রিপোর্ট দিলো। মুসা এবার চূড়ান্ত হামলার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। এক বছর সময় নিয়ে সবকিছু গোছালেন। মুসা রহ. ছিলেন ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ। একজন তাবেরী। হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

অধীনস্থ তারিক বিন যিয়াদকে পাঠালেন আন্দালুসে। সাথে দিলেন ৭০০০ সৈন্য। ৯২ হিজরীর শাব্বান মাসে। ৭১১ খ্রিস্টাব্দের জুনে। তারিক আন্দালুসে গিয়েছিলেন ‘সাবতা’ দ্বীপ হয়ে। তারীফ বিন মালিকও এখানে ঘাঁটি গেঁড়েছিলেন। স্পেনের শাসক ছিল রডারিক। তার অত্যাচারে দেশবাসী অতিষ্ঠ ছিল। সাবতার প্রশাসক জুলিয়ানও রডারিকের প্রতি বেজায় অসন্তুষ্ট ছিল। মুসলিম বাহিনী এজন্য সাবতায় উষ্ণ সহযোগিতা পেয়েছিল।

রডারিকের কাছে মুসলিম আগমনের সংবাদ পৌঁছর। খবরটা তেমন পাত্তা পেল না তার কাছে। সে মনে করলো, একদল লুটেরা এসেছে। সহজেই তাড়িয়ে দেয়া যাবে। ভাগ্নের নেতৃত্বে একদল সেনা পাঠালো। আগত বাহিনী যুদ্ধে পরাস্ত হলো। পরাজয়ের সংবাদ শুনে রডারিকের টনক নড়লো। এবার নিজেই এক লাখ সেনা সমাবেশ ঘটালো। সসৈন্যে এগিয়ে এলো। তারিক বিশাল সেনাবাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে, প্রধান সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর কাছে সংবাদ পাঠালেন। মুসা তখন ছিলেন ‘কায়রাওয়ানে’। বর্তমানে তিউনিসিয়ার একটি শহর। মুসা দ্রুত সাড়া দিলেন। তরীফ বিন মালিকের নেতৃত্বে আরো ৫০০০ সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় বারো হাজারের মতো।

তারিকের বাহিনীর বেশিরভাগ সদস্য ছিল আমায়ীগ (বারবার) গোত্রের। মুসা ও তারিক উভয়ও ছিল বারবার। ওয়াদি লাক্কাতে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। এখান থেকে শুরু হলো মুজাহিদ বাহিনীর জয়ের ধারা। ৯২ হিজরীর রামাদানের ২৮ তারিখ রোববারে। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে ১৯-শে

জুলাই। যুদ্ধ একাদিক্রমে আটদিন পর্যন্ত চললো। এর মধ্যে রামাদান শেষ হয়ে, শাউয়াল এসে গেলো। মুসলমানরা দীর্ঘ সময় লাগলেও বিপুল বিক্রমে লড়াই চালিয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদ বাহিনীকে বিজয় দান করলেন। তারিক প্রথম জয় নিয়ে বসে থাকলেন না। একের পর এক শহর জয় করে চললেন। ছোট ছোট দলে ভাগ করে, মুজাহিদ বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে পাঠালেন। চারদিকে একযোগে জয়যাত্রা শুরু হলো।

তারিক প্রায় ৭০০০ মুজাহিদ নিয়ে রাজধানী তুলায়তালার দিকে রওনা করলেন। ইতিমধ্যে কর্ডোভা-গ্রানাডা-মালাকা-মুর্সিয়াসহ বড় বড় শহরে মুজাহিদ বাহিনী পাঠানো হয়ে গেছে। প্রতিটি দলে সাতশ'র বেশি সেনা ছিল না।

মুসা রহ. আগে বলে দিয়েছিলেন তারিককে। জাইয়ান শহর বা কর্ডোভা শহর পার না হতে। রাজধানী তুলাইতালা জয়ে তাড়াহুড়া না করতে। তারিক দেখলেন, তুলায়তালা জয়টা অতি সহজেই হয়ে যাবে। তাই তিনি ভাবলেন:

-মুসা শত্রুদের অধিক্য ও শহরটার দুর্ভেদ্যতার কথা ভেবে, আর মুজাহিদ বাহিনীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে, শত্রুদেরকে অনায়াসে হারিয়ে দেয়া সম্ভব। তাই তিনি এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এদিকে মুসা রহ. দেখলেন তারিক নির্দিষ্ট সীমারেখা পার হয়ে আরও সামনে অগ্রসর হয়ে গেছে। তার চিন্তা হলো, মুসলমানরা না জানি এই দ্রুতগতির বিজয়ে বিপদে পড়ে যায়? মুসা ছিলেন অত্যন্ত স্থিরমস্তিস্কের মানুষ। ধীরেসুস্থে কাজ করার পক্ষপাতি। তাই তারিকের কাছে নির্দেশ পাঠালেন, তিনি না আসা পর্যন্ত বিজয় অভিযান স্থগিত রাখতে। অভ্যন্তরীণ গোছানোর কাজ করতে।

মুসা স্বয়ং আন্দালুস যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। আঠার হাজার সেনার নতুন একটা বাহিনী প্রস্তুত করলেন। তারিকের সাথে যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল, তারা ছিলো প্রায় সবাই বারবার। এবার মুসার সাথে যারা যাচ্ছে, তাদের প্রায় সবাই ছিল আরব। ইরাক শাম ও ইয়ামান থেকে এসেছে। নতুন দেশ জয়ের জিহাদে অংশ নিতে। শুরু হলো নতুন করে বিজয়াভিযান। তারিক সাবতা থেকে তুলাইতালা পর্যন্ত আসতে এক বছর লেগেছিল। এবার মুসা রহ.-এর নেতৃত্বে বাদবাকী অঞ্চল জয় করতে আরো এক বছর লাগলো। মোট দুই বছরে আজকের স্পেনের প্রধান প্রধান শহর, বর্তমানের পর্তুগাল পর্যন্ত মুজাহিদ বাহিনী পৌঁছে গেলো।

শুরু হয়েছে:

৯২ হিজরীর রামাদানে। ৭১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে।

মোটামুটি একটা ধাপ শেষ হলো

জিলকদ, ৯৪ হিজরী। আগস্ট ৭১৩ খ্রিস্টাব্দ।

এরপর মুসা ও তারিক উভয়ের সম্মিলিত বাহিনী নবউদ্যমে অভিযান শুরু করলো। এবার শুরু

হলো দক্ষিণ দিকের জয়। সারাকুস্তা, বার্সেলোনা জয় হলো। মুজাহিদ বাহিনী চলতে চলতে পিরেনিজ পর্বতমালার পাদদেশে উপনীত হলো। তখন ৯৫ হিজরী ও ৭১৪ খ্রিস্টাব্দ চলছিল। এরমধ্যে খলীফা ওলীদ বিন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে সংবাদ এলো: দু'জন দিমাশকে ফিরে এসো। মুসা রহ. তার পুত্র আবদুল আযীযকে আন্দালুসের দায়িত্ব দিয়ে দিমাশকের পানে রওয়ানা দিলেন। সাথে নিলেন তারেক বিন যিয়াদকে ও আরও অসংখ্য গণীমত।

মুসা বিন নুসাইর রহ. ও তারিক বিন যিয়াদ রহ. আর আন্দালুসে ফিরে আসেন নি। এখানকার শাসন চলতে লাগলো খলীফার নিয়োগ করা ওয়ালি বা গভর্নরদের মাধ্যমে। তারিক বিন যিয়াদ থেকে শুরু করে শেষ ১৩৮ হিজরী পর্যন্ত ছেচল্লিশ বছরে সর্বমোট তেইশ জন প্রশাসক আন্দালুসের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। গড়ে একেক জন দুই বছর করে দায়িত্বে ছিলেন।

অনেক হিশেব-নিকেশ বাকী আছে। অনেক অভিযোগের উত্তর রয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ পরে হবে।

-আতিক উল্লাহ

alaminn5g

একনজরে ইতিহাস (হারানো ফিরদাওস):৩

দ্বিতীয় ধাপ

তাকে বলা হয় সক্রুর কুরাইশ। কুরাইশের বাজ। উপাধিটা আপনজনের দেয়া নয়, জনমশত্রুর দেয়া। আবদুর রাহমান বিন মু'আবিয়া বিন হিশাম। জন্ম ১১৩ হিজরী। ৭৩১ খ্রিস্টাব্দ। মৃত্যু: ১৭২ হিজরী। ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

উমাইয়া খিলাফার সর্বশেষ খলীফার নাম ছিলো মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ। যোগ্য খলীফা। আব্বাসীদের সাথে জানপ্রাণ দিয়ে লড়েও শেষরক্ষা করতে পারলেন না। সময়টাই ছিলো তার প্রতিকূলে। বিলুপ্ত হয়ে গেলো উমাইয়া বংশ। ১৩২ হিজরীতে। আব্বাসীরা রীতিমতো চিরুনি অভিযান চালিয়ে উমাইয়াদেরকে হত্যা করতে থাকলো। উমাইয়া শাহাদারা যে যার মতো পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে শুরু করলো। এমন এক শাহাদা ছিলেন, আবদুর রহমান বিন মু'আবিয়া। তিনি লালিত পালিত হয়েছিলেন দাদা খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের কাছে। রাজ প্রাসাদে। বাবা মু'আবিয়া মারা গিয়েছিলেন ভরা যৌবনে ১১৮ হিজরীতে। আবদুর রহমান তখন পাঁচ বছরের। এতিম নাতিদেরকে দাদা নিজের কোলে তুলে নিলেন। দাদাজান তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আপন চাচা বীর মুজাহিদ মাসলামাহ বিন আবদুল মালিকও ভাতিজাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি নিজ হাতে ভ্রাতুষ্পুত্রকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়েছেন। সাহসী করে তুলেছেন।

আব্বাসীদের ধাওয়া খেয়ে আবদুর রাহমান নানার বাড়িতে পালালেন। মা ছিলেন বারবার গোত্রের। আফ্রিকার। সেখানে গিয়েও তিষ্ঠাতে পারলেন না। স্থানীয় প্রশাসকরা ভয় পেলো, দলছুট উমাইয়া শাহাদারা এসে তাদের ক্ষমতায় ভাগ বসাতে পারে, এই ভেবে তারাও আব্বাসীদের মতো খড়গহস্ত হয়ে উঠলো। তারপরও এদিক-সেদিক করে পাঁচ বছর লুকিয়ে থাকলেন। সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। ১৩৬ হিজরীতে একান্ত অনুচর বদরকে পাঠালেন আন্দালুসে। সেখানে বনু উয়াইয়ার অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী আছে। আন্দালুস এতদিন তো উমাইয়াদেরই অধীন ছিলো। উমাইয়া শাসনের শেষ দিকের কয়েকজন খলীফা ছিলো অত্যন্ত অযোগ্য। তাদের অকর্মণ্যতার সুযোগে আন্দালুস হয়ে পড়েছিল চরম নৈরাজ্যপূর্ণ একটি অঞ্চল। সেই শুরু থেকেই আন্দালুসে আগত মুসলমানদের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা বিভেদ ছিলো। আরব ও বারবারদের মধ্যে। ক্রমে ক্রমে সেটা বড় হয়েছিল। আরবদের মধ্যেও কয়েকটা ভাগ তৈরী হলো: ইয়ামানী আরব। কায়স গোত্রীয় আরব। মুদার গোত্রীয় আরব। নানামুখি সংঘাতে আন্দালুসের অখন্ডতা ভেঙে পড়েছিল। একেকটা গোত্র একেকটা অঞ্চল দখল করে শাসন করতে শুরু করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে আন্দালুসে আসেন আবদুর রাহমান।

তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করলেন। নিজের কিছু অনুসারী আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। আসার পর কৌশলে অগ্রসর হতে লাগলেন। কোনও

দলের প্রতিই সমর্থন দেখালেন না। আন্তে আন্তে শক্ত একটা ভিত তৈরী হলো। গড়ে তুললেন একটা রাষ্ট্রীয় কাঠামো। একে একে জয় করতে থাকলেন বিভিন্ন শহর। গোত্রীয় শাসন ভেঙে আবার আন্দালুসকে ফিরিয়ে আনলেন একক শাসনাধীনে।

আন্দালুসে শক্তিশালী একটা উমাইয়া সালতানাত গড়ে উঠুক এটা আব্বাসীদের হজম হওয়ার কথা নয়। দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা ছিলেন আবু জা'ফর মনসুর। তিনি বাইশ বছর খলীফা ছিলেন। ৭৫৪-৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ। আবু জা'ফর বাগদাদ থেকে কলকাঠি নেড়ে আন্দালুসে একজন অনুচর তৈরী করতে সমর্থ হলেন। আলা বিন মুগীস। এই প্রথম বারের মতো আবদুর রাহমান কঠিন বাধার সম্মুখীন হলেন। ১৪৬ হিজরীর কথা এটা। আলা বিন মুগীস প্রায় দুই মাস অবরুদ্ধ করে রাখলেন আবদুর রহমানকে। কারমুনা শহরে।

আবদুর রহমান দেখলেন এভাবে বন্দী হয়ে থাকলে কোনও সমাধান আসবে না। করুণ পরিণতি বয়ে আনবে এই অবরোধ। তার চেয়ে বীরের মতো লড়াই করে মরাই ভাল। দুর্গ ছেড়ে সৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন। তুমুল লড়াইয়ের পর আলা বিন মুগীস পরাজিত হলো। আবদুর রহমান এক অভিনব কাজ করলেন। তিনি আলা বিন মুগীসের মস্তক কর্তন করে, আব্বাসী খলীফার দরবারে 'শ্যুভেনির' হিসেবে পাঠালেন। ছিন্নমস্তার সাথে আলাবিনের কান কেটে, প্রতিটি কানের সাথে মালিকের নাম লিখে পাঠালেন। আবু জা'ফর তখন মক্কায় হজের সফরে ছিলেন। উমাইয়া যুবকের এহেন কাণ্ড দেখে আবু জা'ফর বাকহারা হয়ে গেলেন। সম্মিত ফিরে পেয়েই সেই বিখ্যাত উক্তিটা করলেন:

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমার ও সেই শয়তানের মাঝে একটা সাগর রেখেছেন।

বক্তব্যের ভাবটা এমন ছিলো: সাগর না থাকলে, ওই ব্যাটা না জানি আরো কত কি করতো! আবু জা'ফর তখনই সেই উপাধিটা দিলেন: সক্রু কুরাইশ।

অভ্যন্তরীণ গোলযোগ শেষ হলো। এবার দেখা দিল বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশংকা। কিছু আরব তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে নি। এভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসা! বিদ্রোহী আরবরা তলে তলে ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলো। তারা ফরাসী সম্রাট শার্লাম্যান (৭৪২-৮১৪)-কে ডেকে আনলো। শার্লাম্যান বোকার মতো সাড়া দিলো। ১৬১ হিজরীতে। ৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। পিরেনিজ পর্বত পেরিয়ে এলো ক্রুশেডার বাহিনী। সারকুস্তা শহরের উত্তরে দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো। প্রায় সমূলে বিনাশ হলো খ্রিস্টান ক্রুশেডারদের। শার্লাম্যান ভগ্নহৃদয়ে ফিরে গেলেন ফ্রান্সে। শার্লাম্যানের সেনাপতিদের মধ্যে ছিল রোল্যান্ড নামের বীর নাইট। সেও এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। রোল্যান্ডকে নিয়ে রচিত হলো বিখ্যাত ফরাসী মহাকাব্য।

আবদুর রাহমান ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। ১৬৪ হিজরীর দিকে, শার্লাম্যানের আহবানে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে সম্মত হলেন। আপাতত ভেতরে ও বাইরে আর কোনও শত্রু রইল না। দেশে স্থাপিত



হলো স্থিতিশীলতা। রাজধানী কর্ডোভাবে গড়ে তুললেন ফেলে আসা স্মৃতির শহর ‘দিমাশকের’ মতো করে। দিমাশক আজীবন আবদুর রাহমানকে উদাস করে তুলতো। তিনি ছিলেন একজন কবি। যুদ্ধ ও প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি চমৎকার সব কবিতাও রচনা করে গেছে। মাত্র বিশ বছর বয়েসে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন।

দাদাজি হিশামের প্রাসাদের নাম ছিল ‘রুসাফা’। আবদুর রাহমানও কর্ডোভায় দাদার স্মৃতি বিজড়িত প্রাসাদের নামে হুবহু আরেকটি রুসাফা তৈরী করলেন। এটার নামও দেয়া হলো রুসাফা। শতভাগ মিল রাখতে, দিমাশক থেকে খেজুর গাছ এনে রোপন করা হলো। প্রায় তেত্রিশ বছর শাসন করেছেন আন্দালুসকে। গড়ে দিয়ে গেছেন, অনাগত ভবিষ্যতের দীর্ঘ অভিযাত্রার পথকে।

১৭০ হিজরীতে শুরু করলেন কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ। সাত বছর লাগলো সমাপ্ত হতে। ‘সাকালেবা’ বাহিনী গঠন করলেন। খ্রিস্টান এলাকা থেকে কিনে আনা ছোট ছোট বালকদের কিনে আনা হতো। এদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হতো। ঠিক উসমানীদের ‘জানেসারীন’ বাহিনীর মতো।

হিশাম বিন আবদুর রহমান

বাবার পর মসনদে আরোহণ করলেন হিশাম। ১৭২-১৮০ হিজরী। বাবার মতো না হলেও, হিশাম যোগ্য মুসলিম শাসক ছিলেন। অত্যন্ত দীনদার আর জ্ঞানানুরাগী মুতাকী ছিলেন তিনি। তার শাসনামলেই আন্দালুসে মালেকী মাযহাবের বিস্তার ঘটে। ইমাম মালেক রহ.-এর খাস শাগরেদ ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া লাইস রহ.-এর হাত ধরে। হিশাম একলক্ষ্য মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করেছিলেন। সীমান্তের কাছে খ্রিস্টান সৈন্যদের হাতে বাধাপ্রাপ্ত হন। যুদ্ধ হলো। খ্রিস্টানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। হিশাম আর অগ্রসর হলেন না। গনীমত নিয়ে ফিরে এলেন। এটা ছিলো ১৭৭ হিজরী ৭৯২ খ্রিস্টাব্দের কথা।

হাকাম বিন হিশাম

১৮০-২০৬ হিজরী।

বাপ-দাদার সুনাম রক্ষা করতে পারেন নি। নিজেকে ভোগ-বিলাসে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। দুর্বলতা ঢাকা দিতে প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত রুঢ় আচরন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এমনকি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ফকীহ ইয়াহইয়া রহ.-এর গায়েও হাত তোলার দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নিগৃহীত প্রজাদের অনেকেই আন্দালুস ত্যাগ করে মরক্কো ও অন্যান্য শহরে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল।

বড় বড় উজীর ও আমীররা হাকামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করলো। ২০২ হিজরীতে দরিদ্র ও বঞ্চিতরা নাগরিক বিদ্রোহ শুরু করলো। হাকাম অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বিদ্রোহ দমন করলো।

দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলার সুযোগে ফরাসি সম্রাট শার্লাম্যান বার্সেলোনা দখল করে নিলো। ১৯০

হিজরীতে। হাকামও বেশিদিন বাঁচলো না। শরীরে রোগ বাসা বেঁধেছিল। নিজের অতীত কর্মকাণ্ডে অনুতাপও শুরু হয়েছিল মনে মনে। ভাল হওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন শেষদিকে। হায়াতে কুলোয়নি।

আবদুর রাহমান বিন হাকাম

২০৬-২৩৮

বাবার চেয়ে ছেলে ভাল। পরদাদার মতো যোগ্য ও চৌকশ না হলেও, আবদুর রাহমান একেবারে অযোগ্য ছিলেন না। কোমলে-কঠোরে মেশানো ছিল তার চরিত্র। বুঝতেন ঠিক কোথায় কঠোর হতে হবে, কোথায় নরম হতে হবে। বাবার আমলে নিগৃহীত মুফতি ইয়াহইয়াকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হলো। পদটা ছিলো বর্তমানের ধর্মমন্ত্রী ও বিচারপতির সমন্বিত পদ।

এই আমলে উল্লেখযোগ্য দুইটা ঘটনা ঘটে:

এক: জলদস্যু

আন্দালুসের উপকূলে নর্মান জলদস্যুদের আক্রমণ। কালো কালো পাল সম্বলিত দ্রুতগতির নৌকায় করে তারা আসতো। নিরাপদ জায়গা দেখে ঘাঁটি গাড়তো। উপকূলবর্তী এলাকায় দ্রুতগতিতে ব্যাপক লুণ্ঠরাজ চালিয়ে আবার পালিয়ে যেতো। তাদেরকে শায়েস্তা করা যাচ্ছিল না। এতদিন পর্যন্ত আন্দালুসের শাসকরা নৌশক্তির দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পাননি। প্রয়োজনও হয়নি। আবদুর রাহমান এদিকে মনোযোগ দিলেন। দুটি নৌবহর গড়ে তুললেন:

ক: ভূমধ্যসাগরের নৌবহর।

খ: আটলান্টিক মহাসাগরের নৌবহর।

এছাড়াও আগের সেই গোত্রীয় কলহ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। মুদার ও ইয়ামানী গোত্রের মধ্যে। আন্দালুসের পূর্বাঞ্চলের মুর্সিয়াতে। প্রায় সাত বছর স্থায়ী হয়েছিল এ অন্তঃকলহ। আবদুর রহমান এই দ্রোহকে দক্ষতার সাথে নিভিয়ে এনেছিলেন।

দুই: মুস্তা'রিব

আন্দালুসে ইসলাম আগমনের পর, স্থানীয় খ্রিস্টানদের অনেকেই মুসলমান হয়েছিল। খ্রিস্টান থেকে যাওয়া বেশির ভাগই ভাষা ও সংস্কৃতিতে আরব হয়ে উঠেছিল। চলনে বলনে নিজেদেরকে আরব করে তুলতে সচেষ্ট থাকতো। যদিও ধর্মকর্মে তারা খ্রিস্টানই ছিল। এদেরকে মুস্তা'রিব বলা হতো।

নিজ ধর্মের মানুষের এভাবে খোলস বদলে রক্ষণশীল খ্রিস্টান পাদ্রীরা চিন্তিত হয়ে উঠলো। একজন চরম ধর্মাত্মক পাদ্রী গোপনে খ্রিস্টানদেরকে সংগঠিত করে তুলতে শুরু করলো। নিজ ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাল। আস্তে আস্তে একটা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো। এদের কর্মকাণ্ড অনেকটা আত্মঘাতি ও আত্মহুতিমূলক অন্তর্ঘাতি ছিল। আবদুর রহমান কৌশলে

এদের আন্দোলকে প্রশংসিত করে আনেন। তার শাসনকাল ছিল ২০৬-২৩৮ হিজরী। দীর্ঘ সময় পেয়েছিলেন।

-আতিক উল্লাহ

alammin5g

আল-আন্দালুস: আমাদের হারানো ফিরদাওস:৯

৩০ ডিসেম্বর। ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, গ্রানাডার মুসলমানদের অবস্থা ছিল কয়েক ধরনের:

এক: কিছু পরিবার মরক্কো ও অন্য মুসলিম দেশে চলে গিয়েছিল। কিছু পরিবার যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

দুই: কিছু পরিবার খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তির ওপর নির্ভর করে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

তিন: কিছু পরিবার খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তিতে বিশ্বাসী বা আস্থাশীল ছিল না। তবুও অজানার পথে পা না বাড়িয়ে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অথবা আন্দালুসকে ভালোবেসে।

চার: একজন মানুষই ছিলেন ব্যতিক্রম। মুসা বিন আবি গাসসান রহ.। তিনি এই চুক্তি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি গ্রানাডা ত্যাগ করেন। একাই খ্রিস্টানদের সাথে গেরিলা যুদ্ধে নেমে পড়েন। খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করতে করতেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। -আতিক উল্লাহ

alaminn5g

মুসা বিন নুসাইর -এর বার্সেলোনা  
তারেক বিন যিয়াদ -এর বার্সেলোনা

শুরুতে বার্সেলোনার প্রতি একরকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। খেলার পাতায় বার্সেলোনার খবর দেখলে  
উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাতাম।

কিন্তু এখন সেই বার্সেলোনার খবর চোখে পড়ে। বুকটা চিনচিন করে উঠে। খবর আর পড়া হয়  
না। লজ্জায়, অনুতাপে চোখ ফিরিয়ে নেই। আমাদের হাতেই তো তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন এ স্বপ্নিল  
শহর। ইতিহাসখ্যাত দুজন মুসলিম সেনাপতি:

১. মুসা বিন নুসাইর
২. তারেক বিন যিয়াদ।

**-জুবাইর বিন আলতাফ**

alammin5g

এক চুমুকে ইতিহাস: ১১৮

-  
ছবিটা তোলা হয়েছে ১৮৯৯ সালে। স্পেনের টলেডো (তুলাইতালা) শহর থেকে। নদীতীরে দুটি নারী। লাজুক-শালীন পোষাকে। পানি নেয়ার পাত্রটির ডিজাইনও মুসলিম যুগের।

আন্দালুস একেবারে সম্পূর্ণরূপে হাতছাড়া হয়েছে ১৪৯২ সালে।

টলেডো হাতছাড়া হয়েছে আরও আগে। ১০৮৫ সালে।

প্রায় ৯৩০ বছর পরও ইসলামের প্রভাব মুছে যায় নি।

গ্রানাডা পতনের প্রায় ৪০০ বছর পরও ইসলামকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি।

-আতিক উল্লাহ





আল-আন্দালুস: আমাদের হারানো স্বর্গ:৬

১৫৬৭ সালে একটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্দালুসের সমস্ত হাম্মাম (গোসলখানা) ভেঙে দেয়া হয়।

মুসলিম আগমনের পূর্বে স্পেনে ও ইউরোপে গোসল করা ছিল একটা ধর্মীয় অপরাধ। আটশ বছর পর, স্পেন আবার আগের নোংরা অতীতে ফিরে গিয়েছিল। -আতিক উল্লাহ

alammin5g

দিনলিপি-৪১৯

(২৭-১২-২০১)

দুই 'মা'!

--

বর্তমানে একটি মুসলিম দেশের রানী। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ইবাদী খারেজী। সম্প্রতি এক ঘোষণায় বলেছেন:

-আল হামদুলিল্লাহ! আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হলো।

কৌতূহল জাগাই স্বাভাবিক! কী সেই স্বপ্ন?

এটা তো সবার জানা আছে, বায়তুল মাকদিস ফিলাস্তীনে হলেও, এটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে জর্দানের রাজ পরিবার। অফিসিয়ালভাবে আরকি। বাস্তবে কতটুকু কী হয় আল্লাহই ভালো জানেন। তাহলে কি তার স্বপ্ন: আলআকসা মুক্ত হওয়া?

= জ্বি না।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের প্রচার-প্রসারে রাজপরিবারের বেশ নামডাক আছে। তাহলে কি রানীর স্বপ্ন কোনও মুসলিম বিজ্ঞানীর যুগান্তকারী আবিষ্কার?

= জ্বি না।

তার স্বপ্ন কি আণবিক বোমা আবিষ্কার, যার মাধ্যমে জর্দান ইসরাইলের গোলামি থেকে মুক্তি পাবে?

-তাও না।

রানীর স্বপ্ন কি সিরিয়া-ইরাক-কাশ্মীর-শীশান-আন্দালুস-নির্যাতিত মুসলিম ভূখন্ড থেকে কুফফার শক্তিতে বিতাড়ন?

-তা নয়।

রানীর স্বপ্ন কি পুরো কুরআন কারীম হিফয করা? সাত কেরাতের সাথে?

= জ্বি না।

তার সারাজীবনের স্বপ্ন ছিলো: নির্দিষ্ট একটা ব্র্যান্ডের বেলজীয় চকলেট সংগ্রহ করে খাওয়া। সেটা পূরণ হওয়াতে রানী বিপুল উৎসাহে মিডিয়াকে জানাচ্ছেন।

এই একই রানী আগে বেশ ঘটা করে যুবরাজ হাশিমকে 'বার্সেলোনা' ক্লাবের ম্যাচজয়ের সংবাদ দিয়ে হৈ চৈ ফেলেছিলেন।

এই একজন নেতৃস্থানীয় মায়ের যদি এই হালত হয়, ভবিষ্যত সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে এভাবে চকলেট আর ফুটবলের সবক দিয়ে লালন-পালন করেন, তাহলে অন্যদের কী অবস্থা

সহজেই অনুমেয়!

.

আরেক মায়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই, তিনি সন্তানকে ছেলেবেলাতেই, কোলে নিয়ে, গল্পবলার ছলে বলছেন:

-মুহাম্মাদ! ওই যে দেখা যায়, কনস্টান্টিনোপল। আমাদের নবিজী সুসংবাদ দিয়ে গেছেন: এই শহর একদিন মুসলমানরা জয় করবে। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, শহরটা যেন আল্লাহ তোমার হাতেই মুসলমানদের পদানত করেন!

.

এই সন্তান কি জীবনে আর কখনো মায়ের দু'আর কথা ভুলতে পারবে? সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে মা তার মধ্যে স্বপ্নের বীজ বুনে দিলে, সেটা কি মুছে যেতে পারে? আর সেটা যদি এমন বৃহত আর মহত কোনও স্বপ্ন হয়?

আর যদি স্বপ্নের সাথে আসমানী ইশারা আর নববী দু'আ থাকে, আর কিছু লাগে?

.

বর্তমানে কয়জন মা তার সন্তানকে এমন প্রেরণা দিয়ে বড় করে?

কয়জন মা তার সন্তানকে বিশ্ব মুসলমানের দুর্দশার কথা বলে, কষ্টের কথা বলে?

কয়জন মা সন্তানকে বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের স্বপ্ন দেখায়?

.

আজ শতকরা কয়জন মা জর্দানী রানীর মতো?

আজ শতকরা কয়জন মা মুহাম্মাদ আলফাতিহের মায়ের মতো?

-আতিক উল্লাহ

এক চুমুকে ইতিহাস: ৪০

---

মু'তামিদ বিন আব্বাদ (১০৬৯-১০৯১)। তিনি ছিলেন বনী আব্বাদ শাসকদের মধ্যে তৃতীয় ও শেষ শাসক। তিনিই মুরাবিত শাসক 'ইউসূফ বিন তাশাফীন (রহ.) কে আন্দালুসে ডেকে এনেছিলেন।

আবুল হাসান ওবাইদুল্লাহ ছিল তার ছেলে ও যুবরাজ। বাবাকে বললো :

-আপনি যে মুরাবিতদেরকে ডেকে আনছেন, তারা তো আপনার ক্ষমতাও ছিনিয়ে নিবে!

-বেটা! আমি তো দারে ইসলাম (আন্দালুস)-কে দারে কুফুরে পরিণত হতে দিতে পারি না। আমি এদেশকে খ্রিস্টানদের হাতেও ছেড়ে দিতে পারি না। এমনটা যদি হতে দিই, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা আমার ওপর লা'নত করতে থাকবে না!

খোদার কসম! মারাকেশের সুলতানের উট চরানো আমার কাছে বেশি প্রিয়, খ্রিস্টানদের গুরুর চরানোর চেয়ে!

এরপরেই সংঘটিত হয় ইতিহাসখ্যাত 'যাল্লাকার যুদ্ধ'। মু'তামিদ সে যুদ্ধে বীরের মতো জিহাদ করেন।

**-আতিক উল্লাহ**

আহ, কর্ডোভা..!

আহ, গ্রানাডা.....!

আহ, সালাগা.....!!

আহ, মালাকা.....!!

আহ, মুরশিয়া.....!!

আহ, টলেডো.....!!

আহ, মালকুন.....!!

আহ, উন্দুলুস.....!!!

আহ, দুনিয়ার স্বর্গ.....!!!!

alaminn5g

\*\*\* এক নজরে আন্দালুসে আমাদের কাল \*\*\*

৩০শে এপ্রিল ৭১১ থেকে ২রা জানুয়ারি ১৪৯২ পর্যন্ত আন্দালুসিয়া আমাদের কর্তৃত্বে ছিল।

৭১১ থেকে ৭৫৬ পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফাহর অধীনেই ছিল।

খিলাফতের গভর্নরগণ:

- ★ মুসা বিন নুসাইর, ৭১১-৭১৪
- ★ আব্দুল আযিয ইবনে মুসা বিন নুসাইর, ৭১৪-৭১৬
- ★ আইয়ুব ইবনে হাবিব লাখমি, ৭১৬
- ★ হুর ইবনে আব্দুর রহমান সাকাফি, ৭১৬-৭১৮
- ★ সামহ ইবনে মালিক খাওলানি, ৭১৯-৭২১
- ★ আব্দুর রহমান গাফিকি, ৭২১-৭২২
- ★ আমবাসা আল কালবি, ৭২১-৭২৬
- ★ উয়রা আল ফিহরি, ৭২৬
- ★ ইয়াহইয়া আল কালবি, ৭২৬-৭২৮
- ★ হুয়াইফা আল কায়েসি, ৭২৮
- ★ উসমান খাসআমি, ৭২৮-৭২৯
- ★ হাইসাম আল কিলাবি, ৭২৯-৭৩০
- ★ মুহাম্মাদ আল আশজায়ি, ৭৩০
- ★ আব্দুর রহমান গাফিকি, ৭৩০-৭৩২ (২য় বার)
- ★ আব্দুল মালিক আল ফিহরি, ৭৩২-৭৩৪
- ★ উকবা ইবনে হাজ্জাজ, ৭৩৪-৭৪০ (কোনো কোনো মতে, ৭৩৭-৭৪২)
- ★ আব্দুল মালিক আল ফিহরি, ৭৪০-৭৪২ (কোনো কোনো মতে, আব্দুল মালিক একবারই শাসন করেন ৭৩২-৭৩৭ এবং উকবা ৭৩৭-৭৪২ পর্যন্ত)
- ★ বালজ আল কুশাইরি, ৭৪২
- ★ সালাবা আল আমালি, ৭৪২-৭৪৩
- ★ আবুল খাতার আল কালবি, ৭৪৩-৭৪৫
- ★ ছুওয়াবা আল জুয়ামি, ৭৪৫-৭৪৬
- ★ আব্দুর রহমান আল লাহমি, ৭৪৬-৭৪৭
- ★ ইউসুফ আল ফিহরি, ৭৪৭-৭৫৬

৭৫৬ এর ১৫ই মে "প্রথম আব্দুর রহমান" ইমারতে কুরতুবা প্রতিষ্ঠা করেন।



ইমারতে কুরতুবার আমিরগণ :

- ★ আব্দুর রহমান (১ম), ৭৫৬-৭৮৮
- ★ হিশাম (১ম), ৭৮৮-৭৯৬
- ★ হাকাম (১ম), ৭৯৬-৮২২
- ★ আব্দুর রহমান (২য়), ৮২২-৮৫২
- ★ মুহাম্মাদ (১ম), ৮৫২-৮৮৬
- ★ মুনযির, ৮৮৬-৮৮৮
- ★ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, ৮৮৮-৯১২
- ★ আব্দুর রহমান (৩য়), ৯১২-৯২৯

১৬ই জানুয়ারি ৯২৯ এ তৃতীয় আব্দুর রহমান কুরতুবা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

খিলাফতে কুরতুবার খলীফাগণ:

- ★ আব্দুর রহমান (৩য়), ৯২৯-৯৬১
- ★ হাকাম (২য়), ৯৬১-৯৭৬
- ★ হিশাম (২য়), ৯৭৬-১০০৮
- ★ মুহাম্মাদ (২য়), ১০০৮-১০০৯
- ★ সুলাইমান ২য়, ১০০৯-১০১০
- ★ হিশাম (২য়), ১০১০-১০১২ (২য় বার)
- ★ সুলাইমান (২য়), ১০১২-১০১৬ (২য় বার)
- ★ মুই'তি, (দানিয়ায়), ১০১৪-১০১৬
- ★ আব্দুর রহমান (৪র্থ), ১০১৭
- ★ আলি ইবনে হাম্মুদ আন-নাসির, ১০১৬-১০১৮
- ★ কাসিম ইবনে হাম্মুদ আল মা'মু, ১০১৮-১০২১
- ★ ইয়াহইয়া ইবনে আলি ইবনে হাম্মুদ আল-মু'তালি, ১০২১-১০২৩
- ★ কাসিম ইবনে হাম্মুদ আল মা'মু, ১০২৩ (২য় বার)
- ★ আব্দুর রহমান (৫ম), ১০২৩-১০২৪
- ★ মুহাম্মাদ (৩য়), ১০২৪-১০২৫
- ★ ইয়াহইয়া ইবনে আলি ইবনে হাম্মুদ আল-মু'তালি, ১০২৫-১০২৬ (২য় বার)
- ★ হিশাম (৩য়), ১০২৬-১০৩১

উল্লেখিত খলীফাগণের মাঝে "হাম্মুদ" শব্দ থাকা খলীফাগণ হাম্মুদি খলীফা নামে পরিচিত।  
বাকিরা উমাইয়া। (এখানেও অনেক ভাগ্যগড়ার ঘটনা পরতে পরতে লুকিয়ে আছে...)

১০৩১ সালে উমাইয়া খেলাফত ভেঙে টুকরো টুকরো রাজ্যে পরিণত হয়। এই রাজ্যগুলো ইতিহাসে "তাইফা" নামে পরিচিত।

alammin5g

## \*\*\* এক নজরে আন্দালুসে আমাদের কাল \*\*\* (২য় পর্ব)

১০১০ সাল থেকেই আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফত বিভিন্নভাবে ভাঙতে থাকে এবং ১০৩১ সালে সম্পূর্ণই ভেঙ্গে যায়।

পরবর্তী যুগকে চারভাগ করা যায়।

১. তাইফা; তাইফা বিভক্ত অঞ্চলগুলোকে বলা হয়ে থাকে। এই যুগকে আন্দালুসের ফিতনার যুগও বলা হয়ে থাকে।

২. মুরাবিতিন।

৩. মুওয়াহহিদিন।

৪. ফিতনার যুগ।

★ তাইফাগুলোর তালিকা;

\* তাইফা পশ্চিম শিতমুরিয়া, ১০১১-১১০৪

\* তাইফা খাদ্রা উপদ্বীপ, ১০৩৫-১০৫৭

\* তাইফা আলমুরিয়া, ১০১১-১০৯১

\* তাইফা আলবুনাত, ১০০৯-১১০৬

\* তাইফা আরকুশ, ১০১১-১০৬৮

\* তাইফা বাতলিউস, ১০০৯-১০৯৪

\* তাইফা কারমুনা, ১০১৩-১০৯১

\* তাইফা সাবতা, ১০৬১-১০৮৪

\* তাইফা কুরতুবা, ১০৩১-১০৯১

\* তাইফা দানিয়াহ এবং শারকি উপদ্বীপ, ১০১০-১০৭৬

\* তাইফা গারনাতাহ, ১০১৩-১০৯০

\* তাইফা থিরিকা, অজানা

\* তাইফা লিশবুনা, ১০২২- তাইফা বাতলিউসের সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।

\* তাইফা লুরকা, ১০৫১-১০৯১

\* তাইফা মালাকা, ১০২৬-১০৫৮

\* তাইফা মাইউরিকা, ১০১৮-১২০৩

\* তাইফা মিরতুলা, ১০৩৩-১০৯১

\* তাইফা মুলিনা, খেলাফত থেকে আলাদা হওয়া থেকে ১১০০ ইসাদ

\* তাইফা মুরুর, ১০১৩-১০৬৬

\* তাইফা মার্সিয়া, ১০১১-১০৬৫

\* তাইফা সাগুন্ত, ১০৮৬-১০৯২

\* তাইফা লিবলা, ১০২৩-১০৯১

- \* তাইফা রুনদা, ১০৪০-১০৬৫
- \* তাইফা রাওইদা, ১১১৮-১১৩০
- \* তাইফা ওইলবা ও শালতিস উপদ্বীপ, ১০১২-১০৫৩
- \* তাইফা পূর্ব শিত্তমুরিয়া, ১০১৮-১০৫১
- \* সিজুরবি, ১০৬৫-১০৭৫
- \* তাইফা ইশবিলিয়া, ১০২৩-১০৯১
- \* তাইফা শিলব, ১০৪০-১০৬৩
- \* তাইফা তালিতা, ১০১০-১০৮৫ (কোনো কোনো মতে, ১০৩১ থেকে ১০৮৫)
- \* তাইফা তরতুশা, ১০৩৯-১০৬০
- \* তাইফা বালানসিয়া, ১০১০-১০৯৪
- \* তাইফা সারকাস্তা, ১০১৮-১১১৮

আলফানসু ষষ্ঠকে প্রতিহত করতে তাইফা ইশবিলিয়ার আমির মুতামিদ দাউলাতুল মুরাবিতির আমির ইউসুফ বিন তাশফিনকে আন্দালুসে আনলে সেই ধারাবাহিকতায় আন্দালুস মুরাতিবিন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। যা মোটামুটি ১১৪৭ পর্যন্ত থাকে। তারপর মুওয়াহহিদিনরা আগমন করে তারা ১২৪৮ পর্যন্ত আন্দালুসিয়ায় ক্ষমতা আকড়ে থাকে। এরপর আবার উপরোক্ত তাইফাগুলোই একক বা একাধিক মিলে ছোট ছোট রাজ্য সৃষ্টি করে। (মুরাবিতিন ও মুওয়াহহিদিন যুগেও এর ধারা অব্যাহত ছিল।) এর মধ্যে ইমারাতু গারনাতাহ ১২৩০-১৪৯২ পর্যন্ত মৌলিকভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে ছিল এবং ছিল আন্দালুসের তৎকালীন মুসলমানদের শেষ সেই..... খড়কুটা.....

\* উল্লেখ্য, নামগুলো আরবি থেকে অনুবাদ করেছি। কুরতুবা, ইশবিলিয়া, তালিতা, তরতুশা, বালানসিয়া, গারনাতাহ, লিশবুনা যথাক্রমে কর্ডোভা, সেভিল, টলেডো, টরটোসা, ভ্যালেন্সিয়া, গ্রানাডা, লেসবনের আরবিরূপ। অন্যান্যগুলোও এরূপ পার্থক্য থাকতে পারে।  
দ্বিতীয়তঃ আমার নজর খুবই ছোট। এক নজরে দেখেছি। ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। ভুল ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো। আর বিনয় নয়, প্রকৃত সত্য হলো- আমি আন্দালুসের তারিখের উপরে প্রাথমিক ছাত্র।

আর আন্দালুস পুনরুদ্ধারের স্বপ্নদ্রষ্টা সেই পুরনো কাফেলার এক নগণ্য যাত্রী.....

ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ...

- ভাই আবু দাউদ

আল-আন্দালুস: আমাদের হারানো ফিরদাওস:৭

আন্দালুসেও খিলাফাহ ছিলো। ১০২০ থেকে ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ। এই এক দশকের মধ্যেই খিলাফাহ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রধান কারণ ছিলো দু'টি:

ক: বারবার জাতির বিদ্রোহ।

খ: গোত্রীয় রাজাদের উদ্ভব।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১২টারও বেশি নগররাষ্ট্র জন্ম নিয়েছিল: গ্রানাডা। ইশবীলিয়া। আলমেরিয়া। ভ্যালেন্সিয়া। তুলাইতালা। সুরকুস্তাহ। আলবারাযীন। বিতলিউস।

এরা একে অপরের সাথে নিরন্তর লড়াইয়ে লেগেই থাকতো।

ইশবীলিয়া ও তুলাইতালাহর শাসকরা চড়াও হয়েছিল কুরতুবার শাসকের ওপর। ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সক্ষম হয়েছিল মু'তামিদ বিন আব্বাদ। তিনি ছিলেন ইশবীলিয়ার শাসক। ১০৭৮ সালে।

কুরতুবা হারিয়ে ফেলেছিল এতদিনকার রাজধানি হিশেবে থাকা অবস্থান। সাথে সাথে খিলাফাহর শেষ চিহ্নটা মুছে গেলো।

-আতিক উল্লাহ

alaminn

ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস:১৬

কাল্লার ৫২৭ বছর

-

\*আন্দালুস (স্পেন) আমাদের। আর কারও নয়। আন্দালুস আমাদের ভালোবাসা। আন্দালুস আমাদের হৃদয়ের রানী।

\* ২রা জানুয়ারি হলো আন্দালুস হারানো দিবস। আন্দালুস আমাদের থেকে হাতছাড়া হয়েছে ৫২৩ বছর হলো।

\*আগামী ২ জানুয়ারী আন্দালুস হারানোর ৫২৩ বছর পূরণ হবে।

\*আমরা প্রতি বছর এই দিবসটি পালন করার চেষ্টা করি। ইসলামে দিবস পালনের সংস্কৃতি নেই। তারপরও আমাদের সুবিধার্থে আমরা এই দিবসটিকে বেছে নিয়েছি। আমরা যে উদ্যোগগুলো নিয়ে থাকি, তা এই :

এক: আমরা বেশি বেশি আন্দালুসের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করি।

দুই: সবাই কিছু হলেও স্পেনের ইতিহাস নিয়ে লেখার চেষ্টা করি।

তিন: আমাদের পতনের কারণগুলো বের করার চেষ্টা করি।

চার: আমাদের এই হারানো স্বর্গকে ফিরে পাওয়ার জন করণীয় কি, সেটা বের করার চেষ্টা করি।

পাঁচ: ভবিষ্যতে যাতে আমাদের কোনও মুসলিম দেশ কাফিরদের হাতে চলে যেতে না পারে , তার জন্য কর্মকৌশল নির্ণয় করি।

ছয়: সর্বোপরি আল্লাহর কাছে দু'আ করি। তিনি যেন মুসলিম উম্মাহকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেন।

\*স্পেন হলো আমাদের হারানো ফিলিস্তিন। আমরা প্রায় আটশ বছর এই দেশ শাসন করেছি। এই দেশের আকাশে-বাতাসে আমাদের কথা ছড়িয়ে আছে।

\*আন্দালুস হলো আমাদের নয়নের মণি।

**-আতিক উল্লাহ**



এক চুমুকে ইতিহাস: ৩৮

---

আন্দালুস বিজেতা মুসা বিন নুসাইর (রহ.) এর একটা পা ছিল খোঁড়া।

প্রতিবন্ধীত্ব সত্ত্বেও নিজেই সেনাবাহিনির নেতৃত্ব দিতেন। স্বয়ং ময়দানে উপস্থিত থেকে জিহাদে অংশ নিতেন। এভাবে ৮০ বছর বয়েস পর্যন্ত।

তিনি জীবনে একটা যুদ্ধেও হারেন নি। তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন :

-জন ও জীবন সঙ্গ দিলে, আমি পুরো রোম সাম্রাজ্য জয় করে ফেলতে পারবো। ইনশাআল্লাহ।

-আতিক উল্লাহ

alammin5g

একনজরে ইতিহাস (হারানো ফিরদাওস):১

আন্দালুস ছিল আমাদের অমূল্য রত্ন। অনেক মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এক ফিরদাওস।

আন্দালুসের পরতে পরতে মিশে আছে:

তারীফ বিন মালিকের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ।

তারিক বিন যিয়াদের দৃঢ়-সংকল্প।

মুসা বিন নুসাইরের অবিচলিত ঈমান।

আবদুর রহমান দাখিলের দুঃসাহস।

আবদুর রহমান গাফেকীর উচ্চাশা।

সামাহ বিন মালিক খাওলানীর অকুতোভয় শৌর্য।

ইউসুফ বিন তাশাফীনের দৃঢ়চিত্ততা, মহানুভবতা।

৯২ হিজরী থেকে ৮৯৭ হিজরী। প্রায় আট শ বছর। এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসকে মোট দশটা স্তরে ভাগ করা হয়।

প্রথম ভাগ: ৯২-১৩৮ হিজরী।

৯২ হিজরীতে শুরু হয় আন্দালুস জয়ের অভিযান। উমাইয়া খিলাফাহর একটা প্রদেশের মর্যাদা পায় আন্দালুস। বীর মুজাহিদ বাহিনী আন্দালুসে অভিযান চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৩৮ হিজরীতে উমাইয়া খিলাফাহর বিলুপ্তি হয়। আব্বাসীদের হাত থেকে পালিয়ে আবদুর রহমান দাখিল আন্দালুসে প্রবেশ করেন। শুরু হয় নতুন অধ্যায়।

দ্বিতীয় ভাগ: ১৩৮-২৩৮ হিজরী।

আগে আন্দালুস ছিল উমাইয়া খিলাফাহর অধীন একটা প্রদেশ। এবার হলো স্বাধীন রাষ্ট্র। নতুন করে বিজয় অভিযান শুরু হয়। আন্দালুস আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে উন্নতি ও উৎকর্ষের দিকে।

তৃতীয় ভাগ: ২৩৮-৩০০ হিজরী।

অবনতি ও বিভক্তির যুগ। এটা অব্যাহত থাকে আবদুর রহমান নাসিরের শাসনকালের সূচনা পর্যন্ত।

চতুর্থ ভাগ: ৩০০-৩৬৮ হিজরী।

আন্দালুসে ঐক্য পুনরুদ্ধার। খিলাফতের ঘোষণা।

পঞ্চম ভাগ: ৩৬৮-৩৯৯ হিজরী। উযীর ও আমীরদের ক্ষমতার ভাগাভাগি। আমেরী সালতানাতের প্রতিষ্ঠা।

ষষ্ঠ ভাগ: ৩৯৯-৪২২ হিজরী।

দ্বিতীয় অধঃপতন যুগের সূচনা। উমাইয়া বংশীয় শাসনের সমাপ্তি।

সপ্তম ভাগ: ৪২২-৪৮৪ হিজরী।

তওয়ায়েফ বা গোত্রীয় শাসকদের যুগ। আন্দালুসের প্রায় বড় শহরকে কেন্দ্র করেই একটা নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়।

অষ্টম ভাগ: ৪৮৪-৫৩৯ হিজরী।

মুরাব্বীতীনের যুগ।

নবম ভাগ: ৫৩৯-৬২০ হিজরী।

মুয়াহহিদীনের যুগ।

দশম ভাগ: ৬২০-৮৯৭ হিজরী।

বনু আহমার ও বনু নাসরের রাষ্ট্র। মুসলিম শাসনসীমা শুধু গ্রানাডায় সংকোচন। মুসলিম শাসনের অবলুপ্তি।

-আতিক উল্লাহ

alaminn5g

এক চুমুকে ইতিহাস: ১৩৮

-

আন্দালুস বিজয় হয়েছিল উমাইয়া খিলাফতকালে। কিন্তু চিন্তাটা প্রথম শুরু হয়েছিল উসমান রা. আমলে। মুসলিম বাহিনী তৃতীয় খলীফার আমলে কনস্টান্টিনোপলের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। অবরোধও করেছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি। তখন উসমান (রা.) বলেছিলেন: -সাগর জয়ের আগে, কনস্টান্টিনোপল বিজয় সম্ভব নয়। তোমরা যখন আন্দালুস জয় করবে, তবে তোমরাও শেষ যমানায়, কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সওয়াবে অংশীদার থাকবে।

উকবা বিন নাফে ৬৩ হিজরীতে চেষ্টা করেছিলেন সাগর পার হতে। তবে চেষ্টাটা সফল হয়নি।

চিন্তাটার যথার্থ বাস্তবায়ন ঘটেছিল উমাইয়া খলীফা ওলীদ বিন আবদুল মালিকের আমলে। খলীফা আর মুসা বিন নুসাইর বসে আন্দালুস বিজয়ের একটা রোডম্যাপ তৈরী করেছিলেন।

-আতিক উল্লাহ

alaminn

জিলহজ্জ, হিজরী সনের শেষ মাস। আজ ২৮ তারিখ। ২৯, ৩০; আর মাত্র দুইদিন পরেই শেষ হতে যাচ্ছে হিজরী ১৪৩৯ সনের। শুরু হবে ১৪৪০ হিজরী সাল। ইসলামে বছর শেষে বা নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে কোন সুন্নাহ বা কালচারাল প্রোগ্রাম বা অন্যকোন দায়িত্ব নেই। যা আছে হিজরী বর্ষ ও মাস গণনার দায়িত্ব।

“তিনি সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় ও চাঁদকে আলোময়। অতঃপর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন কিছু মনজিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছর গণনা এবং দিন-তারিখের হিসাব” (ইউনুস : ৫)  
আমরা চাঁদ ও সূর্যের মাধ্যমে বছর গণনা করে থাকি।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে কালেমা ছাড়া বাকি চারটি স্তম্ভ আমলের উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে নামাজই কেবল সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। অন্য তিনটি সিয়াম, হজ্ব ও যাকাত চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত। কখন রমাদান শুরু করতে হবে, কখন কুরবান, আশুরা, আইয়ামে বীজের রোযা হবে, কখন যাকাত ফরজ হবে ইত্যাদি চাঁদই বলে দেয়। নামাজ ব্যতীত আমাদের অন্যান্য ধর্মীয় কাজগুলো চাঁদের উপরই নির্ভরশীল।

-

সৌরবর্ষের মাসের নামগুলো রোমানদের বিভিন্ন শয়তান ও সম্রাটের প্রতীক। যেমন ‘জানুয়ারি’ নামটি দেওয়া হয়েছে ‘জানুস’ নামের শয়তানের সম্মানে। রোমানদের মতে, ‘জানুস’ এর ছিল দুটি মুখ। একটি সামনে, অন্যটি পেছনে। একটি মুখ তাকিয়ে আছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে, অন্যটি বিদায়ী অতীত পানে। তাই জানুয়ারিকে বছরের প্রথম মাস করা হয়েছে। তাই তারা জানুসকে খুশি করতে বর্ষবিদায় ও নববর্ষের আগমনে ঘটা করে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও অনুষ্ঠান পালন করে। মুসলিমরাও বর্ষবিদায় ও নববর্ষের ইহুদি সংস্কৃতিতে নিজেদের বেশ জড়িয়ে নিয়েছে। নবী (স) এমেনে এমেনে বলেননি যে, “যে তাদের অনুসরণ করবে, সে তাদেরই একজন।”

এছাড়াও সাপ্তাহিক দিনের নামও বিভিন্ন শয়তানের পরিচয় বহন করে। যেমন- স্যাটারডে বা শনিবার; রোমানরা বিশ্বাস করত যে, চাষাবাদের জন্য ‘স্যাটান’ নামের একজন শয়তান আছে, যে আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তার সম্মানার্থে সপ্তাহের একটি দিনের নাম স্যাটারডে রাখা হয়।

-

মুসলমান হিসেবে হিজরী সাল ও মাসের সাথে আমাদের ব্যাপক পরিচয় থাকার কথা ছিল। মুহাররম, রমাদান, যুলকা’দা, যুলহাজ্জা; কী সুন্দর নাম।

সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন আমরা শনিবার, রবিবার, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এইসব নামগুলো পাল্টে ফেলব এবং তৎপরিবর্তে ফেরেশতাদের নাম, সাহাবাগণের নাম, ঐতিহাসিক যুদ্ধের নাম বা এমন কোন নাম রাখব, যা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের পরিচয় বহন করবে।

এবং তার প্রস্তুতি শুরু হোক ১৪৪০ হিজরী সাল থেকে। এখন থেকে আপনি নিজে ও আপনার পরিবারে হিজরী মাসকে আবার পরিচয় করিয়ে দিন এবং তার চর্চা করুন।

**-মুহাম্মাদ মুজাহিদুল ইসলাম**

alammin5g



আল-আন্দালুস: আমাদের হারানো ফিরদাওস:১০

কর্ডোভা আমাদের ছিল। কর্ডোভার জামে মসজিদ আমাদের ছিল। এখন নেই। সেটা আর মসজিদও নেই। গীর্জায় রূপান্তরিত হয়েছে।

শত শত বছর ধরে সেখান তিন খোদার পূজা হচ্ছে। এক আল্লাহর ইবাদত সেখানে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু ১৯৭৭ সালে ঘটেছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তৎকালীন বিশপ ছিলেন একজন উদার মানসিকতার মানুষ। বাদশাহ ফয়সলের স্পেন সফর। জেনারেল ফ্রাংকোর ব্যক্তিগত আগ্রহ সব মিলিয়ে একবার জামাতে নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়।

বর্তমানে সেখানে একাকী নামায পড়াকেও অপরাধ হিসেবে গন্য করা হয়। নিচের ছবিটা দুর্লভ এক ঘটনার স্বাক্ষী! আমাদের মসজিদ কেঁদে কেঁদে ডাকছে! সাদ্কা মুমিনের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে!

-আতিক উল্লাহ



অান্দালুসের খিলাফাতের বারাকাতঃ  
বাদশাহ হাকাম বিন হিশাম ও কাজীঃ

উমাইয়্যা বংশোদ্ভূত হাকাম বিন হিশাম ছিলেন মুসলিম স্পেনের সুদক্ষ শাসক। তিনি খুবই উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাকে নিয়ে সামান্য একটু অালোকপাত করার চেষ্টা।

একবার তাঁর একজন কর্মচারী কোনো এক ব্যক্তির বাঁদীকে জোরপূর্বক হস্তগত করে এবং উপহার হিসেবে বাদশাহ হাকামের দরবারে পাঠিয়ে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত লোকটি কাজীর নিকট বাদশাহের বিরুদ্ধে মামলা করে দেন।

বিচারক বাদশাহ হাকামকে অাদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাদশাহ কাজীর দরবারে হাজির হলেন। কাজী অাদেশ করলেন-

"বিচার ঐ পর্যন্ত সুষ্ঠু হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ বাঁদীকে হাজির করানো হয়। হয়ত কৃতদাসীকে হাজির করুন, না হলে অামাকে এ পদ থেকে অপসারণ করুন।"

হাকাম বললেনঃ এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা কী নেই ?

কাজী বললেনঃ সেটা কী?

হাকাম বললেনঃ দাসীর প্রকৃত মালিক থেকে তাকে অধিক মূল্যে ক্রয় করা যেতে পারে।

কাজী বললেনঃ সমস্ত সাক্ষী প্রস্তুত এবং সমস্ত প্রমাণাদি উপস্থাপিত। অতএব, এখন অার কোনো ক্রয়-বিক্রয় চলতে পারে না। এখন শুধু ন্যায্যবিচার কার্যকর করার সময় অামাদের হাতে রয়েছে। এখন প্রকৃত হকুমদারকে তার হক বুঝিয়ে দেওয়ার সময়।

বাদশাহ হাকাম কাজী সাহেবের অাদেশ মারফিক তাঁর শাহী মহল থেকে অালোচ্য কৃতদাসীকে নিয়ে অাসার হুকুম দিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে দাসীকে কাজীর সম্মুখে হাজির করা হল। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কাজী সাহেব রায় দিলেন,

"দাসীটিকে তার পূর্বের মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হোক।"

দাসী তাঁর পূর্বের মালিকের নিকট ফেরত গেলো।

কাজীর এ ন্যায্যবিচার ও অপূর্ব সাহসিকতার রোমাঞ্চকর কাহিনী যুগ যুগ ধরে স্পেনবাসীরা তাদের পরবর্তী বংশধরদের নিকট গর্ব সহকারে বর্ণনা করে থাকে।

অাহ!যখন খিলাফাত ছিল,তখন হকুল্লাহ ও হকুল ইবাদ ছিল সবর্প্ৰথম পালনীয়।এর  
রক্ষণাবেক্ষণে খলিফা পর্যন্ত নিজের গর্দানকে ঝুকিয়ে দিতেন!  
কিন্তু উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক ও অন্যতম মাধ্যম খিলাফাহ যখন বিলুপ্ত হল,তখন দুনিয়াটা হল  
উম্মতের জন্য সত্যিকার বসবাসের অযোগ্য জায়গা!

- তাসজিদ আহসানি

alammin5g

آندالوس نلے آلاما اءبالے کبلا

ہسپانیہ آو آون مسلمان کا املا ہل  
مانند حرم پاک ہل آو مفری نظر ملا

پوشلہ آری آاک ملا سآلوں کل نشان ہلا  
آاموش اذانلا ہلا آری باء سآر ملا

روشن تہلا ستاروں کل طرا ان کل سنانلا  
آلمے تہل کبہل آن کل آرے کوہ و کمر ملا

پہر آلرے حسینوں کو ضرورت ہل آنا کل؟  
!باقلا ہل ابہل رنگ مرے آون آگر ملا

کلونکر آس و آاشاک سے دب آائل مسلمان  
مانا، وہ تب و تاب نہلا اس کل شرر ملا

غرناطہ بہل دلاھا مری آنکھوں نل و لاکن  
آسکلا مسافر نل سفر ملا نل آضر ملا

دلاھا بہل دلاھا بہل، سُنالا بہل سُنا بہل  
ہل دل کل آسلل نل نظر ملا، نل آبر ملا

alaminn5g

আল-আন্দালুস: আমাদের হারানো ফিরদাওস:৮

এমন মনকাড়া, হৃদয়ছোঁয়া, উদাসকরা ছবিটা দেখে: একটুও কি মনটা কাঁদে না!

১৪৯২ সালে, ৫২৪ বছর আগে, আমরা এটাকে হারিয়েছিলাম। এই দিনে। ২রা জানুয়ারী।

ইনশাআল্লাহ! আমাদের এই নাড়িছেঁড়া ধন, আবার আমাদের হবে!

সানাখুয়ু মা'আরিকানা মা'আহম!

ওয়া আন্দালুসাহ! ও আমার আন্দালুস! - **আতিক উল্লাহ**



## ॥ আন্দালুস বিষয়ক পিডিএফ বই সংকলন ॥

মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস - [www.pathagar.com/book/detail/1694](http://www.pathagar.com/book/detail/1694)

সৈয়দ ইসমাইল হোসেইন সিরাজী রচিত বই স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা -

[https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC\\_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8\\_%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%BE](https://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%BE)

নিবন্ধ: গ্রানাডা ট্রাজেডি: মুসলিম মিল্লাত এখনো সেই তিমিরেই -

<http://www.pathagar.com/article/detail/26>

### উপন্যাস:

১. স্পেনের রূপসী কন্যা ১ম ও ২য় খণ্ড (আলতামাশ) -

<http://www.pathagar.com/book/detail/1506>

<http://www.pathagar.com/book/detail/1507>

২. আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে (আলতামাশ) - <http://www.pathagar.com/book/detail/1475>

৩ সীমান্ত ঈগল (নসীম হিজাজী) - <http://www.pathagar.com/book/detail/746>

৪ ইউসুফ বিন তাশফিন (নসীম হিজাজী) - <http://www.pathagar.com/book/detail/750>

৫ শেষ বিকেলের কান্না (নসীম হিজাজী) - <http://www.pathagar.com/book/detail/745>

৬ কর্ডোভার অশ্রু (সাইমুন ১২) -

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjomsegkrjfAhUM4o8KHRonCckQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Ffiles.saimumseries.com%2F12.pdf&usg=AOvVaw0\\_j-NG-Q4X0y0HZ\\_1CMYcl&fbclid=IwAR00G7XEAUtTBEaNeM5pfOP8JBzhCJ1YVAubcLMMJDpbz3feJtDpLXudq0](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjomsegkrjfAhUM4o8KHRonCckQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Ffiles.saimumseries.com%2F12.pdf&usg=AOvVaw0_j-NG-Q4X0y0HZ_1CMYcl&fbclid=IwAR00G7XEAUtTBEaNeM5pfOP8JBzhCJ1YVAubcLMMJDpbz3feJtDpLXudq0)



হে আন্দালুস,  
তোমার প্রেমিকেরা আসছে,  
শীঘ্রই আসছে, খুব শীঘ্রই (ইনশা-আল্লাহ্).....

